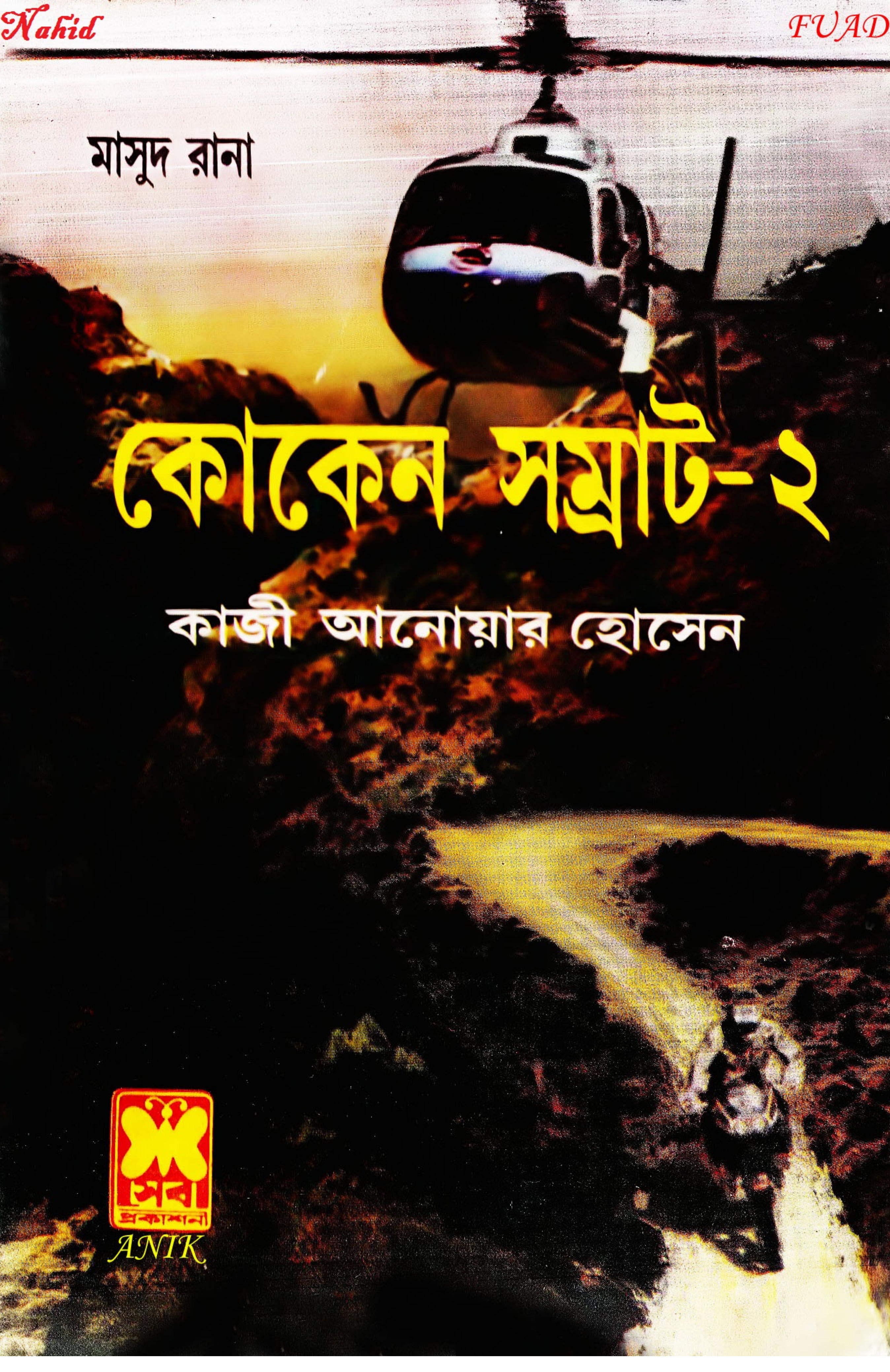

Nahid
FUAD
মাসুদ রানা
কোকেন সম্রাট-২
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ANIK

# কোকেন সম্রাট ২

দুই খন্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশে কোকেন আসছে।

উৎস খুঁজতে গিয়ে কলম্বিয়ার মেডিলিনে হাজির হয়েছে

মাসুদ রানা।

জানা গেছে হিটলারের দোসর, নাৎসি গুপ্তচর

বিভাগের প্রধান হেনেরিক মুলার রয়েছে এর পেছনে।

গভীর জঙ্গলে ঘাঁটি বানিয়েছে সে। সেখানে রয়েছে

বিশাল এক গুদাম, গোটা পৃথিবীর যুব সমাজকে

হতাশার মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য বিপুল মজুত।

হানা দিল রানা।

একা।

**সেবা বই**

**প্রিয় বই**

**অবসরের সঙ্গী**


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

# কোকেন সম্রাট ২

---

## মাসুদ রানা ১৭৭

## কাজী আনোয়ার হোসেন

---

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০



প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শরাফত খান

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২
জি পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-177
COCAINE SAMRAT-2
by Qazi Anwar Husain

# মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর-সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

## প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট অক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

## পূর্বাভাষ

২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৫। ফুয়েরার বাংকার থেকে পালানোর পরিকল্পনা করলেন গেস্টাপো প্রধান হেনেরিক মুলার।

৬ই অক্টোবর, ১৯৮৬। কলম্বিয়ার মেডিলিন শহরে পৌঁছুলো বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা।

বি. সি. আই. একটি এসপিওনাজ সংস্থা, মাতৃভূমির স্বার্থবিরোধী যে-কোনো ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে পাল্টা আঘাত হানার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে ওরা। সংস্থার অকুতোভয় এজেন্টদের মধ্যে মাসুদ রানা একজন। রোমাঞ্চপ্রিয় এই চির-তরুণের মনে রয়েছে শেখার প্রবল আগ্রহ, মাথায় ক্ষুরধার বুদ্ধি, বুকে দুর্দান্ত সাহস। রক্তমাংসের সাধারণ বাঙালী; কিন্তু নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, দেশপ্রেম ও ত্যাগ অজেয় বীরের মহিমা দান করেছে তাকে। বি. সি. আই.-এর একটি কাভার হলো রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি, সঙ্গত কারণেই প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর হতে হয়েছে ওকে। সুমায় রয়েছে অনারারী প্রজেক্ট ডিরে-ক্টরের পদ। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন-এর একজন কমাণ্ডার ও। এছাড়াও, আরো অনেক সংগঠন ও সংস্থার সাথে জড়িত রানা।

এবারের অ্যাসাইনমেন্টে দুটো কাজ নিয়ে কলম্বিয়ায় এসেছে ও। পাকিস্তান ও গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল হয়ে বাংলাদেশে কোকেন ঢুকছে, সেটা বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয় কাজটি হলো, নাৎসী অপরাধী হেনে-রিক মুলারকে খুঁজে বের করা। এ-ব্যাপারে সি. আই. এ.-র দলছুট এজেন্ট লিলিয়ান ওকে কিছু তথ্য দিয়েছে। আর, সি. আই. এ.-র মুখোশ উন্মোচনের জন্যে, যুক্তরাষ্ট্রেরই আরেকটি এসপিওনাজ সংস্থা,

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি, ওর সাহায্য প্রার্থনা করেছে। এন. এস. এ.-র বিশ্বাস, কণ্ট্রা বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্যে টাকার দরকার হওয়ায় সি. আই. এ. গোপনে কলম্বিয়ার কোকেন সম্রাটদের কাছ থেকে মোটা টাকার ঘুষ খেয়েছে।

মেডিলিন শহরে পা দিতে না দিতে রানাকে খুন করার চেষ্টা হলো। জানা গেল, লা ব্লাংকা অর্থাৎ হোয়াইট লেডি রানাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল। রানার সৎ পরামর্শে কান না দিয়ে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনলো হোয়াইট লেডি।

তথ্য ও ইতিহাস জানার জন্যে আলিঙ্গান আকরাম নামে বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের সাহায্য নিলো রানা। ভদ্রলোক ইহুদি ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সি. আই. এ.-র বেঈমানী ও হেনেরিক মুলারের খোঁজ পাবার আশায় মেডিলিনে আসার পর লিলিয়ানও তাঁর সাহায্য পেয়েছিল। লিলিয়ানের কাছ থেকে আগেই জেনেছে রানা, রলফ মুয়েলারকে হেনেরিক মুলার বলে সন্দেহ করে সে। রলফ মুয়েলারের ছেলে ববি মুয়েলারকে বিয়ে করে লিলি, তারপর সি. আই. এ.-র কুকীর্তি ফাঁস করার জন্যে ববি মুয়েলারকে সি. আই. এ.-র একটা অ্যাসাইনমেন্টে কাজে লাগায়। নিজের অ্যাসাইনমেন্টে ব্যর্থ হয় লিলিয়ান, রানার সাহায্য প্রার্থনা করে সে। রানা তাকে মেক্সি-কান দূতাবাসে লুকিয়ে রেখেছে। কলম্বিয়ায় আসার আগে ববি মুয়ে-লারের সাথে দেখা করতে যায় রানা, ওর হাতে খুন হয়ে যায় লোকটা।

হোয়াইট লেডি মারা যাবার পর রানা জানলো, ভিক্টর লজেনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ওকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল মেয়েটা। ভিক্টর লজেন হলো সাঁতেলা লজেনের ছেলে। সাঁতেলা লজেন আর হেনেরিক মুলার প্রায় একই সময়ে কলম্বিয়ায় আসে। বৈবাহিক সূত্রে

ওদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

কলম্বিয়ায় ড্রাগ কার্টেল আইনরক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে প্রায় পঙ্গু করে রেখেছে। কার্টেল-এর প্রথম সারির নেতা ভিক্টর লজেনকে অত্যাচারী সামন্ত প্রভুর মতো বিভীষিকা বললেও কম বলা হয়। কার্টেলের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে রায় দিলে বিচারক খুন হয়ে যান। কার্টেলের বিরুদ্ধে কোনো কাগজে কিছু লেখা হলে রিপোর্টার ও সম্পাদক চিরকালের জন্যে হারিয়ে যান। আইন বা সরকার ভিক্টর লজেনের নাগাল পায় না। নিজস্ব এয়ারলাইন আছে তার, আছে দৈনিক পত্রিকা ও রেডিও স্টেশন। একটা রাজনৈতিক দলেরও নেতা সে। তার সন্ধান পাওয়া সহজ নয় বুঝতে পেরে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু টমাস কালভিনকে সাথে নিয়ে থীম পার্কে এলো রানা, ভিক্টর লজেনের আধ্যাত্মিক গুরু জিম মরিসনের বিশাল স্ট্যাচু আর মিনি একটা প্লেন উড়িয়ে দিলো বোমা মেরে। রানার ধারণা, একের পর এক আঘাত করলে ভিক্টর লজেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৎপর হবে, তাহলেই তাকে ঘায়েল করার সুযোগ পাবে ওরা।

এরপর ভিক্টর লজেনের একটা প্রসেসিং ল্যাবে হানা দিলো ওরা। রানার সাথে পরিচয় হলো কর্নেল হার্নান্দেজ বেনিনের। ডি. এ. এস.-এ আছেন ভদ্রলোক, অত্যন্ত সৎ অফিসার, কার্টেলের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করছেন। ভদ্রলোকের একটাই দুর্বলতা, তিনি প্রচারবিমুখ নন।

বিশাল হাসিয়েনদায় হানা দিয়ে বিপুল কোকেন উদ্ধার করা হলো। কিন্তু ভিক্টর লজেনের কোনো সন্ধান করা গেল না। তবে জানা গেল, গর্ডন উইন্টার নামে একজন আমেরিকান পাইলট ভিক্টর লজেনের হয়ে

কাজ করে, তাকে ধরতে পারলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

গর্ডন উইন্টারকে ধরার জন্যে কালি শহরের মাঝখানে ফাঁদ পাতা হলো। চৌরাস্তায় ঠিক সময়েই হাজির হলো গর্ডন উইন্টার, তবে একা নয়। শুরু হলো বন্দুকযুদ্ধ। অবশেষে রানার হাতে ধরা দিতে বাধ্য হলো গর্ডন উইন্টার।

গর্ডন উইন্টার রানাকে ভিক্টর লজেনের কাছে নিয়ে যেতে পারবে কিনা, ভিক্টর লজেন শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করবে কিনা, বা হেনেরিক মুলার ওরফে রলফ মুয়েলারকে রানা ধরতে পারবে কিনা, এ-সব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে কাহিনীর ভেতর ঢুকতে হবে আমাদের।

# এক

---

ডি. এ. এস. অফিসে জড়ো হলো ওরা। অফিসটা ফেডারেল কোর্ট কমপ্লেক্স-এর ভেতর। লাশ গোনার পর দেখা গেল, গর্ডন উইন্টারকে ফাঁদ পেতে ধরতে গিয়ে ডি. এ. এস.-এর একজন লোক মারা গেছে, আহত হয়েছে দু'জন। শত্রুপক্ষের মারা গেছে পাঁচজন; আহত দু'জ-নের বাঁচার আশা নেই, অপর একজন বাঁচবে কি মরবে তা নির্ভর করছে কর্নেল বেনিনের ওপর। বাকি সবাই পালিয়েছে। নিরীহ পথ-

চারী বা ফেরিওয়ালা যারা হতাহত হয়েছে তাদের কথা ভেবে মন খারাপ করলেও, সরকারী অফিসাররা রানাকে বললো, কলম্বিয়ায় এ-ধরনের মৃত্যু এতো বেশি ঘটে যে কেউ কোনো গুরুত্ব দেয় না। মারা গেছে কিশোর ছেলেটা, নিজের জুতো পালিশ করার বাক্সের পাশে। মারা গেছে একজন বলিভিয়ান ট্যুরিস্ট, সন্দেহ করা হলো লোকটা সম্ভবত ড্রাগ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলো। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারও নিহত হয়েছে। এ-সবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো চৌরাস্তায় জনসম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। ভিক্টর লজেনের অ্যারোভিয়াস অফিসের ক্ষয়ক্ষতিটাকে অফিসাররা ভয়ংকর বলে বর্ণনা করলো। চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল বেনিন।

'আমাদের সাফল্যের কথা ভুলে যাওয়া হবে,' বললেন তিনি। 'আমার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে প্রেস। আপনি কলম্বিয়ায় রয়েছেন, মিঃ রানা। এখানকার হালচাল সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই। কার্টেলের পক্ষে না লেখার সাধ্য এখানে কারো নেই।'

'সংকট উত্তরণ একটা শিল্পকলা,' শান্ত সুরে বললো রানা। 'আগেই সাবধান হতে পারলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দেরি না করে ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে এখুনি একটা বিবৃতি দিন আপনি। স্পষ্ট ও সত্যি হওয়া চাই। মিথ্যে বলবেন না। যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব না হয়, প্রসঙ্গটা তুলবেন না। নিরাপত্তার দোহাই দিন।'

'কিন্তু আপনার কথা কি বলবো আমি?'

'কিছুই বলবেন না। বলবেন, সবই আপনার নেতৃত্বে আপনার লোকজন করেছে। সত্যি কথাই বলা হবে।'

'আমার নেতৃত্বে আমার লোকজন,' ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে বললেন কর্নেল। 'কি করে জানবো সত্যি কথা বলছি আমি?' তিনি

আসলে বিবেকের দংশনে ভুগছেন, রানার কৃতিত্ব এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারছেন না।

সাথে সাথে জবাব না দিয়ে অফিস কামরার চারদিকে চোখ বোলালো রানা। এখানে নিয়মিত অফিস বসে, দেখে তা মনে হলো না। গোটা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন কর্নেল বেনিন, কখন কোথায় বসবেন আগে থেকে কাউকে জানান না। তাঁর মতো আর যাদের আততায়ীদের হাতে খুন হবার ভয় আছে, তাদেরও অফিসে বসার নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই। 'গর্ডন উইন্টারকে ধরার জন্যে যে ফাঁদটা পাতা হয় তার জন্যে আপনার অনুমতি নেয়া হয়েছিল,' বললো রানা। 'অপারেশনে আপনার লোকেরা অংশগ্রহণ করে। হতাহতও তারা হয়েছে। এ-সবই তো সত্যি, তাই না?'

'বোঝা যাচ্ছে, আপনি প্রচার পছন্দ করেন না,' গম্ভীর মুখে বললেন কর্নেল। 'সেক্ষেত্রে, আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানাই। আনঅফিশিয়ালি হলেও, কলম্বিয়া সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি, আপনার প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মিঃ রানা। কার্টেলের সহযোগী এই আমেরিকান লোকটাকে ধরার জন্যে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করেও আমরা সফল হইনি।'

'সমস্ত কৃতিত্ব আপনার,' বললো রানা। 'আজকের অপারেশনে আপনিই হিরো।'

গম্ভীর হাসি ফুটলো কর্নেলের মুখে। 'এডিটর কথা দিয়েছে এক ঘণ্টার মধ্যে টেপটা ফেরত দেবে।'

'ক্যামেরাই সত্যি কথা বলবে। হাসিয়েনদায় আপনার সাফল্যের সরাসরি প্রতিক্রিয়া হলো চৌরাস্তার ঘটনা। কার্টেল আপনাকে ভয় করে, তাই আপনাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। বিবৃতিতে আপনি

আরো বলতে পারবেন, আততায়ীদের লিডার ধরা পড়েছে। কলম্বিয়ায় তার উপস্থিতি প্রমাণ করে ড্রাগ ব্যবসাতে বিদেশী এজেন্টরাও জড়িত।'

চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কর্নেলের, তারপর কি ভেবে উদ্বেগের সাথে তাকালেন টমাস কালভিনের দিকে। অফিস কামরার এক ধারে একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে সে। 'এ-ধরনের একটা ব্যাপার ফাঁস করা হলে মার্কিন সরকার কিভাবে নেবে, মিঃ টমাস? আমি আবার তাদের বিরাগভাজন হবো না তো?'

'গর্ডন উইণ্টারকে আমরা বিশ্ব নাগরিক বলতে পারি,' বললো কালভিন। 'লোভ যে ভৌগোলিক সীমা বা জাতীয়তা মানে না, সে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ব্যাপারটা যদি এভাবে তুলে ধরা হয় তাহলে আমার সরকারের পক্ষে তা সহনীয় হবে।'

'তাছাড়া,' বললো রানা, 'এখুনি আমরা তার পরিচয় প্রকাশ করছি না। বলে দিন, জখমগুলো একটু সারলেই তাকে প্রেসের সামনে হাজির করা হবে।'

'কি বলছেন! সে তো আহতই হয়নি!' পিঠ বাঁকা করে কর্নেল বেনিন নিজেই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়ালেন। 'কথাটা মিথ্যে বলা হবে। বেশ বড় একটা মিথ্যে।'

'এখনো,' প্রথম শব্দটার ওপর জোর দিয়ে বললো রানা, 'আহত হয়নি সে।'

রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন কর্নেল, যেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে মানসিকভাবে সুস্থ নয় ও। কালভিনের দিকে ফিরলেন তিনি। 'উনি কি বলছেন শুনছেন, মিঃ টমাস?'

'আমার বিশ্বাস, রানা বলতে চাইছে, কারো পক্ষে অনাহত হওয়া

সম্ভব নয়,' বললো কালভিন। 'বরং উল্টোটা ঘটা সহজ।'

রক্তপাতের ভালো সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কর্নেল, তবে সতর্কতার সাথে নিশ্চয়তা দাবি করলেন। 'লোকটা আপনার দেশী। তার কষ্ট আর অপমান আপনি মেনে নেবেন?'

'প্রয়োজন হলে, হ্যাঁ,' বললো কালভিন।

রানা বললো, 'তবে বেশিরভাগ সম্ভাবনা ঘটনাটা আপনা থেকেই ঘটবে।'

'আত্মপীড়ন?' জানতে চাইলেন কর্নেল। 'কোনো দাগ থাকবে কি?'

'না,' বললো রানা। 'ঘটনাটা অপারেশনে থাকার সময় ঘটতে পারে।'

'অপারেশন? কিসের অপারেশন?' আকাশ থেকে পড়লেন কর্নেল বেনিন।

'সিনর উইন্টারের সাহায্য নিয়ে যে অপারেশনটা করতে যাচ্ছি আমরা।'

'সাহায্য?' হাঁ হয়ে গেল কর্নেল। 'গর্ডন উইন্টারের মতো লোক আমাদের সাহায্য করবে? অসম্ভব!'

'তার সুমতির প্রতি আবেদন জানাবো আমরা,' বললো রানা। 'তাতে সব সময় কাজ হয়।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কর্নেল। 'আপনি হাসির একটা অ্যাটম বোমা, মিঃ রানা। অদ্ভুত সব কথা বলেন। তবে, স্বীকার করছি, ভিক্টর লজেনকে খতম করতে হলে এ-ধরনের সাহায্য আমাদের পেতে হবে। সে একটা পাগল, আপনি জানেন। সেজন্যেই তাকে আমরা শতো চেষ্টা করেও নাগা-

লের মধ্যে পাইনি।'

'তার নাগাল পাবার জন্যে, আপনি বলতে চাইছেন, আরেক পাগলের দরকার, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন।

'ঠিক পাগল বলতে চাইনি,' সংশোধন করে-দেয়ার সুরে বললেন কর্নেল। 'বলতে চেয়েছি পাগলাটে। আর প্রতিভাবানরা যে এক-আধটু পাগলাটে হয় তা কে না জানে!'

ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকে ওরা দেখলো, কর্নেলের সৌজন্যে খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই গর্ডন উইন্টার। তার ট্রাউজার ছিঁড়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে জুতো জোড়া। লম্বা, খাড়া নাকে সরু একটা লালচে দাগ, দু'পাশে রক্ত শুকিয়ে আছে। মুখ থেকে রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদা চামড়ার ওপর লালচে তিলগুলো ফ্যাকাসে লাগছে। হাত দুটো স্থির রাখতে পারছে না, বারবার লাল চুল আর লাল গোঁফে উঠে যাচ্ছে।

বন্ধ জানালায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো কালভিন, নরম কিন্তু জরুরী সুরে কথা বলতে শুরু করলো। ঠিক যে উইন্টারের দিকে তাকিয়ে বা সরাসরি তার উদ্দেশ্যে কথা বললো সে, তা নয়। ভাব দেখে মনে হলো সামনে উপস্থিত শ্রোতাদের একটা গল্প শোনাচ্ছে।

'গর্ডন উইন্টার। এল গুসানো নামেও ডাকা হয়। অর্থাৎ পোকা। মাঝখান থেকে কেটে ফেলো, ভেতর থেকে শুধু তিল বেরোবে। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি, তরল যে-কোনো জিনিসই ঢক ঢক করে গেলে—মায় পেচ্ছাব পর্যন্ত। শুনেছি পুরনো মদের বোতলে যদি পোকা জন্মায়, তাও খেয়ে ফেলে।'

একটা সিগার ধরিয়ে বন্ধ দরজার পাশে হেলান দিলো রানা।

মাথার ওপর হাত তুললো কালভিন, জানালার গরাদ ধরে বলে চললো, 'প্রথম তার সম্পর্কে আমরা জানতে পারি·· উনিশ শো আটাত্তর সালে···ফুয়েলের অভাবে একটা ডিসি-থ্রি যখন নিরাপদে ফোর্স ল্যাণ্ডিং করে ফ্লোরিডায়। প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে এক লোক পাশের হাইওয়েতে উঠে পড়ে, তার চেহারার বর্ণনার সাথে গর্ডন উইন্টারের চেহারা হুবহু মিলে যায়। লোকটা ভোজবাজির মতো গায়েব হয়ে যাওয়ায় সিনিয়র অফিসাররা মস্ত এক ধাঁধায় পড়েছিল, মনে আছে আমার। তারা আরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্লেনের ভেতর উঁকি দিয়ে। প্রায় চল্লিশ পাউণ্ড হেরোইন ছিলো!' কপালে হাত চাপড়ালো কালভিন, চটাস করে শব্দ হলো। 'এক লোককে গ্রেফতার করা হলো, পরিত্যক্ত প্লেন থেকে হেরোইন ভর্তি একটা ব্যাগ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল সে। এল গুসানোর কিছুই হলো না, বেচারা পথিকের জেল হয়ে গেল। তার বউ অবশ্য তাকে বারণ করে-ছিল, কান দেয়নি সে। বউটা পাইলটকেও দেখেছিল, বলেছে পঞ্চাশ বছর পরও চেহারাটা মনে করতে পারবে।'

কালভিনের কথায় উইন্টারের কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। কাল-ভিনের দিকে ভুলেও তাকালো না সে, তাকালো রানার দিকে। বললো, 'আপনি আমেরিকান নন। বুঝতে পারি যখন আপনি আমার মাথার ঠিক ওপরে দু'টো গুলি করলেন। যদি আমেরিকান হতেন, কি ঘটতো, জানেন? প্রথমত, আপনার মতো সাবধান করার চেষ্টা না করে সরাসরি মাথায় গুলি করতো সে। আর যদি কোনো বিশেষ কারণে আপনার মতো সাবধান করার জন্যে গুলি করতো, নির্ঘাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো সে, এতোক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম আমি। কাজেই, শুধু যদি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যেও হয়, আপনার পরিচয়টা আমার জানা দরকার।'

কথা না বলে রানা শুধু নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকালো।

বাধাটাকে বাধা বলে গ্রাহ্য করলো না কালভিন, সে তার কথা বলে চলেছে, 'ফ্লোরিডার ওই এলাকাতেই বসবাস করছে বউটা, আমি তার ঠিকানা জানি। শেষবার দেখা হয়েছে গত বছর। স্বামী জেল থেকে বেরোবার পরপরই মারা যায়। স্বাভাবিক মৃত্যু, কিন্তু বউটার ধারণা তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হলো সেই লোকটা, যাকে সে প্লেন থেকে নেমে হাইওয়েতে উঠতে দেখেছিল। চেহারাটা মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করায়, সেই আগের উত্তরটাই দিয়েছে সে আমাকে, পঞ্চাশ বছরেও ভুলবে না। এখন আমার কাজ, তোমাকে তার সামনে হাজির করা। সে তোমাকে সনাক্ত করবে। ব্যস, জেলে যাবে তুমি। নিরানব্বুই বছর, কমপক্ষে। আইন তো তোমার জানাই আছে।'

'আপনার গাড়িটা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো, এ যেন এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' রানাকে বললো উইন্টার। 'আহ্, শুধু যদি দরজাটা পেরোতে পারতাম, তাহলে আর আমাকে পেতো কে! পেছনে আরেকটা টাউন কার ছিলো, বুঝলেন।'

জানালার গরাদ থেকে হাত নামিয়ে এগিয়ে এলো কালভিন, নির্লিপ্ত চেহারা। উইন্টারকে পাশ কাটাতে গিয়ে কি ভেবে থামলো সে, তারপর ঠাস করে চড় মারলো তার গালে। টুল থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল উইন্টার।

কয়েক মুহূর্ত নড়লো না সে। রানার ভয় হলো, পোকাটাকে হয়তো সত্যি সত্যি মেরে ফেলেছে কালভিন। ব্যাপারটা ক্ষতিকর হবে। ওদের পরবর্তী কর্মসূচী নির্ভর করছে উইন্টার গোঙায় কিনা তার ওপর। রানার আশা পূর্ণ করে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো সে, চোখ মেলে চকচকে পিতলের বোতামে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখলো। তার দিকে

ঝুঁকে একটা কব্জি ধরলো কালভিন, সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেই বসলো উইন্টার, তারপর দাঁড়ালো। টুলটায় বসতে যাবে, লাথি মেরে সেটাকে কামরার আরেকদিকে ফেলে দিলো কালভিন।

কারো দিকে না তাকিয়ে উইন্টার জিজ্ঞেস করলো, 'রুমাল-টুমাল কিছু আছে, নিজেকে আমার পরিষ্কার করা দরকার।' তার গায়ে ধুলো লেগে রয়েছে।

'তোমাকে পরিষ্কার করতে পারে এমন পদার্থ এখনো আবিষ্কার হয়নি,' বললো কালভিন। 'আমি চাই তুমি মনোযোগ দাও, গর্ডন।'

'তোমার প্রতিটি কথা শুনেছি আমি।'

'কোন্‌টা পছন্দ হয়নি তোমার?'

'মিথ্যেগুলো,' বললো উইন্টার। 'তোমরা, ডি. ই. এ. শুধু মিথ্যে গল্প বানাও।'

দ্বিতীয়বার উইন্টারের গায়ে হাত তুললো না কালভিন। আবেগ জড়িত প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল সে, সেটা পেয়েছে। ভাগ্যের সহায়তা পেলে বাকিটুকু আপনা থেকেই ঘটবে। 'তুমি বোধহয় জানতে চাও, কালি শহরের মাঝখানে বন্দুকযুদ্ধ শুরু করায় ডি. এ. এস. তোমার বিরুদ্ধে কি করতে যাচ্ছে, তাই না?'

'না,' বললো উইন্টার। 'আমি শুধু জানতে চাই আমার কাছ থেকে কি ছাই চাও তুমি।'

এই প্রথম মুখ খুললো রানা, 'ভিক্টর লজেন।'

দু'বার চোখ মিটমিট করলো উইন্টার। তারপর এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো, ভেতরে যেন পানি ভরা আছে। 'আপনি ডি. ই. এ.-এর কেউ নন। ডি. ই. এ.-এর কোনো লোক ভিক্টর লজেন উচ্চারণ করার সময় ঢোক গেলে, তোতলায়। উঁহুঁ, আপনি অন্য কিছু।

ভাবছি··· ।'

'তোমার সাথে প্রথম যখন কথা হলো, তখনই আমি জানিয়েছি, উইন্টার।'

'আপনি বলেছিলেন, মরার সময় হয়েছে।'

'রজার।'

মাথা ঝাঁকালো উইন্টার। ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'আপনি একজন পাইলট?'

'প্রয়োজনে।'

'তাহলে আমার ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পারবেন,' বললো উইন্টার, যেন সে তার ভাইকে খুঁজে পেয়েছে। 'ওটাই আমার আসল পরিচয়, একজন পাইলট। যেখানে নিয়ে যেতে বলে, নিয়ে যাই। যা করতে ইচ্ছে করে, করি। আমি কাউকে অর্ডার করি না, কারণ বিদেশে কেউ আমাকে নেতাদের সারিতে দেখতে চায় না। আমি নেতাদের আদেশ পালন করি, কারণ তাতে ফুর্তির সাথে বেঁচে থাকা যায়। সব মিলিয়ে হিসেব করুন, যোগফল থেকে ভিক্টর লজেনকে পাবেন না।'

'বলতে চাইছো তুমি এতো গুরুত্বপূর্ণ কেউ নও যে ভিক্টর লজেনের মতো লিডারের হদিশ জানবে। তবে আমরা জানি, কার্টেলের সাথে তোমার সম্পর্ক এতোই দুরের ও ক্ষীণ যে আটক করা কোকেন ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে বেশ কয়েকবারই সশস্ত্র দল নিয়ে হামলা চালিয়েছ তুমি।'

কাঁধ ঝাঁকালো উইন্টার। 'আমার দায়িত্ববোধ আছে।' এবার হাসলো না সে।

'আমার জানামতে,' বললো রানা, 'টেক্সাসে তোমার স্ত্রী ও একটা

বাচ্চা আছে। ওদের জন্যে আমরা কিছু করতে পারি।'

'আলোচনার এ-ধরনের মোড় পরিবর্তন আমার ভালো লাগছে না,' বললো উইন্টার। 'আমার স্ত্রী ও বাচ্চা ভালোই আছে। আমার চেয়ে ভালো আছে তারা।'

'উইন্টার, একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো। মার্কিন সরকারের জন্যে তুমি একটা বিড়ম্বনা। তারা চায় না কলম্বিয়ায় তোমার বিচার হোক। বিচারের জন্যে তোমাকে যদি আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়, কি ঘটবে তা তো জানোই। জেল ভেঙে পালাতে পারবে, সে আশা নেই। তোমার একমাত্র উপায় আমাদের সাথে সহযোগিতা করা।'

'আপনি আমাকে জল্লাদ বাছাই করার পরামর্শ দিচ্ছেন, তার বেশি কিছু নয়।'

'সে সুযোগই বা ক'জন পায়?'

'ঠিক আছে, আপনাকে আমি বহন করবো, পাইলট,' দ্রুত বললো উইন্টার।

খুব তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল উইন্টার। আসলে দর কষাকষি শুরু করতে চায় সে। এতোদিন সে আইনকে ফাঁকি দিতে পেরেছে এই গুণটার জন্যে, পরিস্থিতির সাথে দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে বলেই।

'তুমি আমাকে লজেনের কাছে নিয়ে যাচ্ছো,' বললো রানা। 'এখুনি। এই একটাই সুযোগ আছে তোমার।'

বাঁকা এক চিলতে হাসি ফুটলো উইন্টারের ঠোঁটে। 'কিভাবে তা সম্ভব বলে মনে করেন আপনি?'

'হেলিকপ্টারে করে সম্ভব,' বললো রানা। 'চালাতে পারবে তো, দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে?'

'কিছু এসে যায়?'

যথেষ্ট দ্রুত বা যথেষ্ট বুদ্ধিমানের মতো চোখা একটা উত্তর দিতে না পারায় মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার।

পশ্চিম পাহাড়শ্রেণীর পিছনে ঢলে পড়ছে সূর্য, হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠলো ওরা। প্রতিশ্রুতি মতো এইচইউ-টোয়েনটি থ্রি যোগান দিয়েছেন কর্নেল বেনিন, সাথে কো-পাইলট হিসেবে একজন লেফটেন্যান্ট। চালাচ্ছে উইন্টার, ওদের গন্তব্য সম্পর্কে একমাত্র তারই পরিষ্কার ধারণা আছে। কাউকা উপত্যকার ওপর দিয়ে উত্তর-উত্তর-পুব দিকে যাচ্ছে ওরা। তিন হাজার ফুট ওপরে রয়েছে চপার। দু'পাশে মাথা তুলে রয়েছে বিশাল পাহাড় প্রাচীর।

বিশ মাইলের মতো এগোবার পর নিচের উপত্যকা চওড়া হতে শুরু করলো, সমতল ভূমিতে চাষ করা হয়েছে আখ আর তামাক। পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল চপারের নাক। এদিকে শুধু তামাক খেত দেখা গেল, খেতের পাশে বড় বড় দোচালা। খুব নিচু দিয়ে চপার চালালো উইন্টার, দোচালার খড়ের তৈরি চাল রোটরের বাতাসে মনে হলো উড়ে যাবে। রানা বুঝতে পারলো কো-পাইলট আর আরোহী-দের নার্ভ পরীক্ষা করছে লোকটা।

যদি ধরা পড়ে তার উদ্দেশ্য খারাপ, তবু তেমন কিছু করার নেই ওদের, এক গুলি করা ছাড়া। তবে, বেশি বাড়াবাড়ি করলো না উই-ন্টার। কেউ তেমন অস্বস্তিবোধ করছে না দেখে চপার নিয়ে আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এলো সে। সামনে একটা পাহাড়, সেটাকে টপকে যেতে হবে। আটচল্লিশ ফুট লম্বা ওজনদার রোটরের ডগা শব্দ করছে শুনে আপনমনে হাসলো উইন্টার। তার জানা আছে চপারটার

ম্যাক্সিমাম অলটিচ্যুড দশ হাজার ফুটের বেশি নয়। বাতাসের হালকা ভাব দেখে বুঝতে পারছে উচ্চতার শেষসীমায় পৌঁছে গেছে হেলি-কপ্টার। ইন্সট্রুমেণ্ট প্যানেলের দিকে একবারও তাকালো না।

হঠাৎ করে পাহাড়টার মাথায় উঠে এলো ওরা, তীব্র বাতাস কেটে পেরিয়ে এলো শেষ পাহাড়প্রাচীর, নামতে শুরু করলো পাহাড়ী একটা লেকের দিকে। এতোটা ওপর থেকেও গাঢ় নীল দেখালো লেকের পানি। ভূতলের আলোড়ন থেকে সৃষ্টি হয়েছে লেকটা। পাহাড়ী অববাহিকায় কয়েক মাইল জুড়ে গভীর নীল পানির বিস্তার, এতো সুন্দর দৃশ্য খুব কমই দেখেছে রানা।

আরো নিচে নেমে এলো প্লেন। লেকের তীরে কটেজ আর শ্যালে দেখা গেল। মাটিতে দাঁড়িয়ে ওগুলোর বেশিরভাগই নজরে পড়বে না, পাথুরে উত্থান আর গাছপালা এমন ভাবে আড়াল করে রেখেছে। ওরা লেকের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে বলে দেখতে পেলো। চপার নামিয়ে পানির কাছাকাছি চলে এলো উইণ্টার, পানিতে ঝাপটা দিলো রোট-রের বাতাস।

বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে ছুটলো চপার। ক্রমশ সরু হয়ে এলো লেক। পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে থাকা বিশাল একটা পাথরের ওপর ইংরেজি এ অক্ষরের মতো একটা আকৃতি ওদের গন্তব্য। পাথুরে গা বেয়ে নেমে এসেছে সিঁড়িটা জেটি পর্যন্ত। জেটির ওপরই চপার নামালো উইণ্টার। শেষবার রানাকে ইণ্টারকমে জানিয়েছে সে, 'এখানেই কোথাও আছে আপনার লোক। আমি অন্তত জানি যে দু'দিন আগে ছিলো।'

চপার থেকে নেমেই সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে ছুটলো ওরা। রানার সাথে পাঁচজন ডি. এ. এস. অপারেটর, একজনকে ওরা চপারের

কাছে রেখে যাচ্ছে। প্রতিরোধ আশা করছে ওরা, বাড়িতে লোক থাকলে এলোপাতাড়ি গুলি করা হবে। কিন্তু সিঁড়ির মাথায় ওঠার পরও কিছু ঘটলো না। দু'ভাগ হয়ে বিল্ডিঙের দু'পাশ দিয়ে এগোলো ওরা। গ্যারেজের ভেতর দিয়ে পিছনের দরজা, সেটাকে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করে দু'জন অপারেটরকে সাথে নিয়ে একতলার দরজা পেরোলো রানা, তার আগে, উজি বি দিয়ে তালা ভাঙলো। তালা ভাঙার পর সাথে সাথে নয়, গ্রেনেড লঞ্চার দিয়ে টিয়ার গ্যাস ছাড়ার পর ভেতরে ঢুকলো ওরা।

ভেতরটা ফাঁকা। ফার্নিচারগুলো দামী ও সযত্নে রক্ষিত, কিন্তু খালি। কিচেনে সাজানো রয়েছে তৈজসপত্র, সব শুকনো। ক্লজিটে কাপড়চোপড় পাওয়া গেল, কিন্তু সবই গ্রীষ্মকালীন পোশাক, গত বছরে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে টেলিফোনটা জ্যান্তই রয়েছে, ওটার সাথে রেডিও ট্র্যান্সমিটার আর রিসিভারটাও। স্টাডিতে পাওয়া গেল আধুনিক একটা কমপিউটার, সাথে অ্যাড-অন মেমোরি বোর্ড। আবর্জনা ফেলার ড্রামে একটা বাতিল ডিস্ক পেলো রানা, আরো পেলো একটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ, দুই কি তিন ঘণ্টা আগে নেভানো হয়েছে বলে আন্দাজ করলো ও।

এ-সব আবিষ্কার আরো শাস্তি পাবার হাত থেকে রক্ষা করলো উইন্টারকে। ডিস্কটা পাওয়া গেছে বলে খুশি হলো রানা, ওর জানা আছে যোগ্য লোকের হাতে পড়লে নষ্ট একটা ডিস্ক থেকেও কিছু কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। শ্যালেতে কেউ একজন ছিলো, এটাও সুখবর। কে জানে, ভিক্টরই হয়তো ছিলো। উইন্টারকে দোষ দেয়া যায় না, কারণ কার্টেলের লিডাররা কখন কোথায় থাকবে কেউ তা

আগে থেকে বলতে পারে না।

তবে এ-সব কথা উইন্টারকে রানা বললো না। লাথি মেরে লেকের কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে তাকে ফেলে দিলো ও, তার চারপাশে গুলি করলো কয়েকটা। আতংকে ও ঠাণ্ডায় চিৎকার জুড়ে দিলো উইন্টার। রানা তার ভয় দেখে উপলব্ধি করলো, মিথ্যে কথা বললে ধরা পড়ে যাবে। পানি থেকে তোলার পর বললো ও, 'আমি জানি তথ্য গোপন করছো তুমি। এমন একটা কিছু বলো, আমরা যাতে লজেনের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারি। জলদি।'

'ঠিক আছে,' বললো উইন্টার। 'আপনাকে আমি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছি।'

# দুই

বুয়েনস আয়ার্স, আর্জেন্টিনা। ২২শে এপ্রিল, ১৯৫৬।

ব্যাপারটা যে একদিন ঘটবে, হেনেরিক মুলার তা জানতেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে হয় কোনো বন্ধু বা কোনো স্বদেশী। সেজন্যেই জার্মান বলে দাবি করে এমন কোনো সংগঠনের সাথে খুব কমই যোগাযোগ রাখেন তিনি। কলম্বিয়া, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, বলি-

ভিয়া আর চিলির কিছু কিছু এলাকায় জার্মানদের নানা রকম সংগঠন আছে, কখনও ও-সবের ধার দিয়ে যান না তিনি। সেরকম একটা জায়গা হলো বুয়েনস আয়ার্স। তবু, ঝুঁকি আর অস্বস্তিবোধ থাকলেও, মাঝে-মধ্যেই এখানে তাঁকে আসতে হয়।

ইউরোপিয়ানদের সাথে কতো মিল আমাদের, এই বলে গর্ববোধ করলেও আর্জেন্টাইনরা তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। জুয়ান পেরন সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় এসেছেন তিনি, ফলে ধরে নেয়া চলে অজ্ঞাত পরিচয় নাগরিক হিসেবে আর্জেন্টিনার যে-কোনো অংশে স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তার পরপরই, খোঁচানো শুরু হলো। তারা তাঁর আসল পরিচয় না জানলেও, ফেরারি আসামীর গন্ধ ঠিকই শুঁকে ফেলে। এখানকার স্প্যানিয়ার্ড, ইটালিয়ান আর ইহুদিগুলোর নাক খুব লম্বা। শিকারী কুকুরের মতো তারা, যে শিকার আহত হয়েছে তার গোড়ালির দিকে ওদের লক্ষ্য।

ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার হলেন মুলার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইতে গিয়ে। জুয়ান পেরনের স্ত্রী ফার্স্ট লেডি হিসেবে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, যদিও তাঁকে কখনোই কোনো ঝুঁকি নিতে হয় না। মুলারের আবেদন শুনে সহানুভূতি জানালেন তিনি, ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, আর যাতে বিরক্ত করা না হয় সেদিকটা দেখবেন তিনি। বিনিময়ে মুলারের নামে জমা করা ন্যাশনাল ব্যাংকের টাকা ক'টা তাঁকে দিতে হবে। টাকা ক'টা মানে কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মুলার বুঝলেন, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। টাকাগুলো যে দিতে হবে, তা-ও তিনি উপলব্ধি করলেন, কারণ না দিলে যেভাবে হোক কেড়ে

নেয়া হবে তাঁর কাছ থেকে। ওই টাকাগুলোই যে তাঁর শেষ সম্বল তা নয়, তবে এরপর তাঁকে হিসেব করে চলতে হবে। টাকার জোরে যে নিরাপত্তা পাওয়া যায় সেটা হারাবেন তিনি।

অতোগুলো টাকা ফার্স্ট লেডির দ্বারা ডাকাতি হয়ে যাবার কারণেই সাঁতেলা লজেনের সাথে ব্যবসায় নামলেন মুলার। বিশপ হুডালের কলেজে পরিচয় হয় দু'জনের, সেই থেকে নির্বাসিত জীবনের দুঃখ-কষ্ট একসাথেই ভোগ করছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় আসার ব্যাপারেও সাঁতেলার প্রস্তাব মেনে নেন মুলার।

অপরাধ জগতের তথ্য ভাণ্ডার বলা যায় সাঁতেলাকে, যুদ্ধের আগে মার্সেইলেসে ড্রাগ ব্যবসা করারও অভিজ্ঞতা রয়েছে তার, নতুন করে ব্যবসায় নামার জন্যে দুটোই পুঁজি বলে গণ্য হলো।

কর্সিকান সাঁতেলার সব গুণই আছে, নেই শুধু দূরদৃষ্টি আর বিশেষ দক্ষতা, যার ফলে তার একার পক্ষে বড় কোনো নেটওঅর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এখানেই অবদান রাখলেন মুলার। ইউরোপ আর দক্ষিণ আমেরিকায় এমন অনেক ব্যক্তিত্ব আছে যাদের সম্পর্কে গোপন তথ্য জানা আছে তাঁর। যুদ্ধের সময় জার্মানদের সাথে সহযোগিতা করেছে তারা, যুদ্ধের পর সাধু সেজে নাৎসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। ব্যবসার খাতিরে তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

ব্ল্যাকমেইল নামক অস্ত্রের হুমকি থেকে অপরাধী বা রাজনীতিক কেউ পুরোপুরি নিরাপদ নয়। গোপন তথ্যগুলো কোত্থেকে, কিভাবে ফাঁস হচ্ছে তা অনেকে আন্দাজ করতে পারলেও, সঠিকভাবে কেউ উৎসটা চিহ্নিত করতে পারলো না। এ-ব্যাপারে সতর্ক থাকলেন মুলার। নিজের চেহারা বদলে নিয়েছেন তিনি, বদলে নিয়েছেন জীবনযাপনের ছক, ফলে নিজের দুষ্কর্মের কথা গোপন রেখে অন্যের

গোপন তথ্য ফাঁস করার হুমকি দেয়া তাঁর পক্ষে সহজ হলো। তিনি জানেন, ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু বা স্বদেশী ছাড়া আর কারো দ্বারা তাঁর পরিচয় ফাঁস হবার ভয় নেই।

লোকটা কে হতে পারে, তাকে দেখার আগে পর্যন্ত কোনো ধারণা ছিলো না মুলারের। বুয়েনস আয়ার্সে এলে ক্লারিজ হোটেলে ওঠেন তিনি, এবারও উঠলেন। বার-এ ঢুকছেন, দেখেই চিনে ফেললেন লোকটাকে। বার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে সে, অপেক্ষা করছে, গ্লাসটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন জানে না কিভাবে তার হাতে এলো ওটা। কিন্তু যখন চোখ তুললো, পরিচিত সেই ব্যাকুল উন্মাদের দৃষ্টি ফুটে উঠলো মুলারকে চিনতে পেরে। উনি তার অফিসার, ওনার কতো আদেশ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছে সে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার, দৃঢ় পায়ে এগোলো, যেন আদেশ পাবার জন্যে উন্মুখ। 'গ্রুপেনফুয়েরার,' উঁচু গলায়, কিন্তু করুণ বিনয়ের সুরে বললো সে, যেন অনুমোদনের জন্যে আবেদন জানাচ্ছে। 'স্যার!'

এখনো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ভেবে স্প্যানিশ ভাষায় মুলার বললেন, 'মাফ করবেন।'

'স্যার, আমি আইখম্যান। ওবারস্টার্ম ব্যানফুয়েরার অ্যাডলফ আইখম্যান।'

সন্দেহ বা অস্বীকার করার উপায় নেই, উপলব্ধি করলেন মুলার। কথা বলার সময় আইখম্যানের কণ্ঠা ঘন ঘন ওঠানামা করলো, যেন আলগা একটা জিনিস চামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। মাথায় আগের সেই চুল আর নেই, অনেক পাতলা হয়ে গেছে। তবে আগের মতোই নার্ভাস সে।

'কর্নেল,' বললেন মুলার, আইখম্যানকে পাশ কাটিয়ে কোণের

টেবিলটার দিকে এগোলেন, জানেন প্রতিবারের মতো এবারও ওটা তাঁর জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়েছে। 'আমার ধারণা, আমাকে তুমি অন্য কেউ বলে ভুল করেছো।'

'অবশ্যই,' বললো আইখম্যান, চারদিকে দ্রুত চোখ বোলালো, ব্যস্তভাবে পিছু নিলো মুলারের। 'ব্যাপারটা আমি বুঝি, স্যার।'

আদর্শ অধঃস্তন বলতে যা বোঝায়, চিরকাল তাই ছিলো আইখ-ম্যান। তবে মাঝে-মধ্যে দিশেহারা বোধ করতো সে, তখন তাকে বিশ্বাস করা যেতো না। যদি বলা হতো ইউরোপের সমস্ত জিপসী-দের মেরে ফেলো, চোখের পাতা না ফেলে আইখম্যান শুধু জানতে চাইতো কোথায় তাদের পাওয়া যাবে। 'বেশি বুঝতে চেষ্টা করো না,' মুলার বললেন। 'সেটা তোমার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বিপদে পড়তে পারে তোমার আশপাশের লোকজন।'

জড়োসড়ো হয়ে মুলারের সামনে বসে পড়লো আইখম্যান। দুঃস্থ মেয়েদের মতো ভীরু আর কাতর লাগলো তাকে। 'স্যার, প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া আমার অন্তরে আর কিছু কখনো ছিলো না, আজও নেই। আপনি আমার মনিব ছিলেন। আমার কাজ সম্পর্কে একা শুধু আপনি জানতেন। আমি জানি, আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না। আপনার কাজ করার সময় শুধু একটা ঘটনা অন্যভাবে ঘটলে আমি খুশি হতাম। যেদিন আপনি আমাকে ব্লোবেল-এর সাথে ডুয়েল লড়তে বাধা দিলেন, মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা আপনার ঘটতে দেয়া উচিত ছিলো, স্যার। পিস্তলে ভালো হাত ছিলো ব্লোবেলের। আমাকে মেরে ফেলতো সে।'

ঘটনাটা মনে আছে মুলারের। সেদিন নাক গলিয়েছিলেন, আজ

সেজন্যে নিজেকে তিরস্কার করলেন। ব্লোবেল অবশ্যই খুন করতো আইখম্যানকে, কারণ কিভাবে পিস্তল ধরতে হয় তাই ভালো করে জানতো না সে। একজন ফ্যানাটিকের সাহস ছিলো আইখম্যানের, এক ধরনের নিষ্ফল হিস্টিরিয়া যা জার্মেনীকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। যুদ্ধের শেষ দিকে ভুয়া পরিচয়-পত্র চকোলেটের মতো ছড়ানো হয় বার্লিনে, অল্প যে দু'চারজন তা নিতে রাজি হয়নি তাদের মধ্যে আইখ-ম্যানও ছিলো। সংশ্লিষ্ট সবাই এতোটাই বিব্রত বোধ করে যে বাধ্য হয়ে তাকে প্রাগে পাঠিয়ে দিতে হয়।

'বর্তমান জীবনে তুমি সুখী নও বলে মনে হচ্ছে, কর্নেল। এতোটাই খারাপ যে মরে যেতে চাও?'

মৃদু হেসে আইখম্যান বললো, 'এখানে আমি রিকার্ডো ক্লিমেন্ট, স্যার। ভ্যাটিকান থেকে একজন প্রিস্ট পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেন আমাকে, নামটা তাঁরই দেয়া। আর্জেন্টিনায় সপরিবারে বাস করছি আমি, বউ-বাচ্চা নিয়ে। মার্সিডিজ-বেঞ্জ অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টে কাজ করি। আপাতত সামান্য একজন মেকানিক, তবে আশা করি উন্নতি করবো।'

নিজের বোকামিটা টের পেলেন মুলার। পালাবার জন্যে ভ্যাটিকান রুট ব্যবহার করেছে ওবারস্টার্মব্যানফুয়েরার। হুডালের সাথে আলো-চনা করে আয়োজনটা মুলারই করেছিলেন। ভাগ্যই মুলারকে মার্সি-ডিজ ফ্যাক্টরীতে নিয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার লোকটা দক্ষিণ আমেরি-কার সব দেশে গাড়ি রফতানী করতো। মুলারের অনুরোধে যে-কোনো জিনিস রফতানী করতে রাজি ছিলো সে। উনিশ শো তেতাল্লিশ সালের শীতে রাশিয়ান সীমান্তে তিনি যা করেন, তার জন্যে লোকটা মুলারের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলো। সেজন্যে আজও রাশিয়ানরা তাঁকে

খুঁজছে। 'স্বপ্ন আর আশাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখো, কর্নেল। তোমার এমপ্লয়ারকে আমি চিনি। কঠিন পরিশ্রমী লোক তিনি, মর্যাদাবান, অন্যের ভেতর এ-সব গুণ থাকলে তিনি ঠিকই চিনতে পারবেন।'

মাথা ঝাঁকালো আইখম্যান। 'আপনার কাছে আমি কোনো অনু-রোধ নিয়ে আসিনি, গ্রুপেনফুয়েরার। আমি এসেছি, কারণ এক সময় আপনি আমার মনিব ছিলেন। আপনার সান্নিধ্য পাবার লোভটা সামলাতে পারিনি বলে এসেছি। জানি, এটা স্থায়ী হবে না।'

আপনমনে হাসলেন মুলার, ভাবলেন আইখম্যানের ভেতর তাহলে মানবিক দুর্বলতাও কিছু আছে।

# তিন

ভিক্টর লজেনের বিরুদ্ধে একটানা তিন দিন ব্যাপক তৎপরতা চললো। গর্ডন উইন্টারের সাহায্য নিয়ে ডি. এ. এস. তার চারটে আস্তানায় হানা দিলো। পপ্যায়ান শহরের বাইরে একটা বাড়িতে প্রথমবার হানা দিয়ে আরেকটা প্রসেসিং প্ল্যান্ট পাওয়া গেল, স্থানান্তর করার আগের মুহূর্তে উদ্ধার করা হলো সেটা। দ্বিতীয় আস্তানায় পাওয়া গেল ট্রাক ভর্তি কোকেন, তবে কোনো ইকুইপমেন্ট বা কেমিকেল

পাওয়া গেল না। উপকূলীয় শহর বারাঙ্কুইলায় হানা দেয়ার জন্যে দীর্ঘ আকাশ পথ পাড়ি দিতে হলো, একটা ভল্টের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরি করা বাড়িটার ভেতর প্রায় কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু খবরের কাগজে জড়ানো তিন কিলোগ্রাম কোকেন পাওয়া গেল, একটা ব্যবহার করা কনডমের পাশে। দুটোই মনে হলো ভুল করে ফেলে যাওয়া হয়েছে।

শেষ আস্তানায় হানা দিয়ে আরো হতাশ হলো দলটা। ট্যুরিস্টদের শহর মেলগার-এ ওদেরকে নিয়ে এলো উইন্টার, বোগোটা থেকে বেশি দূরে নয়। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটায় কাউকেই পাওয়া গেল না। ভবনটার সাথে ধনী বা কুখ্যাত কারো সম্পর্ক আছে কিনা তাও জানা গেল না, পাওয়া গেল শুধু একটা নোটবুক। এটাও সম্ভবত ভুল করে ফেলে যাওয়া হয়েছে। কাজে লাগতে পারে এমন কয়েকটা ফোন নম্বর পাওয়া গেল নোটবুকে, অন্তত কালভিনের তাই ধারণা।

ইতিমধ্যে ভিক্টর লজেনের অ্যারোভিয়াস এয়ারলাইনের সমস্ত তৎ-পরতা বন্ধ করার জন্যে ইঞ্জাঙ্কশন দাবি করে কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কর্নেল বেনিন। কোর্ট থেকে বলা হয়েছে, ড্রাগ পরিবহ-নের অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত না করা পর্যন্ত অ্যারোভিয়াসের কোনো প্লেন টেক-অফ করতে পারবে না।

কিন্তু ভিক্টর লজেনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এমন হতে পারে যে তার আখড়াগুলোয় হানা দেয়া হচ্ছে দেখে গা-ঢাকা দিয়েছে সে, কিংবা তার সর্বশেষ ঠিকানা জানা নেই উইন্টারের, অথবা জানা থাকলেও চেপে যাচ্ছে।

শেষটাই সন্দেহ করলো রানা। উইন্টারকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখলো না ও। পাইলট হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ সে, কলম্বিয়ার

এয়ার রুট সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বাতাসের বাউণ্ডুলে মতিগতি সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে, মানচিত্রে নেই এমন অনেক এয়ারফিল্ডের খবর তার জানা। আখ খেতের কয়েক হাত ওপর দিয়ে একশো দশ নটে হেলিকপ্টার চালায় সে, রানাকে আতংকিত করে তোলে।

সময়ের সাথে সাথে নিজের স্বভাব-চরিত্র ফিরে পেয়েছে উইন্টার। শুধু যে পাইলট হিসেবে বেপরোয়া সে তা নয়, নিজের রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করার ব্যাপারেও তার কোনো ভয়-ডর নেই। ইন্টারকমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক বক করে সে, কো-পাইলটকে নিজের বীরত্বের কাহিনী শোনায়। রানা ধারণা করলো, ঠিক যে কথাটা ওরা শুনতে চায় সেটা না বলার জন্যে এতো সব কথা বলে চলেছে সে।

মেলগার থেকে ফেরার পথে খোশ মেজাজে রয়েছে উইন্টার, গাছের মগডাল থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার চালাচ্ছে, অনুসরণ করছে আঁকাবাঁকা গিরিখাদ, আতংকিত করে তুলছে নিচের উপত্যকায় বিচরণরত গরু-ছাগলের পালগুলোকে। 'শুনবেন,' ইন্টারকমে রানাকে উদ্দেশ্য করে বললো সে, 'কেন আপনারা ভিক্টর লজেনকে ধরতে পারবেন না? কারণটা হলো, সে হিউম্যান নয়। ভিক্টর লজেন একটা পশু, ইয়েস স্যার।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

'না, আমি বলতে চাইছি পশুদের মতো তার একটা আলাদা সেন্স আছে। কি ঘটবে, আগে থেকে টের পেয়ে যায়। আমি আপনাকে ভুরি ভুরি প্রমাণ দিতে পারি।'

'কি রকম?'

'তার কিছু কিছু আচরণ উদ্ভট পাগলামি বলে মনে হলেও, পরে দেখা গেছে তার পাগলামির জন্যেই একটা বিপর্যয় এড়ানো গেছে।

একটা উদাহরণ দিই। বিরাট একটা পার্টি দিচ্ছে সে। একশোর মতো লোক হয়েছে পার্টিতে। খানাপিনা চলছে, চমৎকার সময় কাটছে সবার। হঠাৎ করে লজেন বললো, চলো। কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলো না, কোনো কারণ ব্যাখ্যা করলো না। পার্টি ভেঙে গেল, ফিরে গেল সবাই। পরদিন তারা জানতে পারলো, পার্টি ভেঙে যাবার খানিক পরই হানা দিয়েছিল পুলিশ। যাঁরা ফিরে যায়নি তারা কেউ গ্রেফতার হয়েছে, কেউ অপমানিত।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে, কিংবা ষড়যন্ত্র,' বললো রানা।

'কিন্তু ভূমিকম্প?' জিজ্ঞেস করলো উইন্টার। 'তাও কি ষড়যন্ত্র করে ঘটানো যায়?'

'কি ঘটেছিল?'

'সান সালভাদরের বড় ভূমিকম্পটার কথা মনে পড়ে আপনার?' জানতে চাইলো উইন্টার।

এক সেকেণ্ড পর রানা বললো, 'পড়ে।'

'লজেন ছিলো ওখানে। সব কিছু ভূমি ধসে চাপা পড়ে যাবার আধ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত। দিবানিদ্রা থেকে উঠে, চোখ কচলাতে কচলাতে বললো, যাবার সময় হয়েছে। রওনা হয়ে গেলাম আমরা। শহর ছাড়ার জন্যে চপার বাঁক নিচ্ছে, ছ'হাজার ফুট ওপরে আমরা, এই সময় এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠালো, তাদেরকে যেন উদ্ধার করা হয়। কি যে দুঃখজনক!'

আগ্রহের সাথেই শুনলো রানা। প্রকৃতি আগেই আভাস দেয়, এটুকু অন্তত বিশ্বাস করে ও। প্রকৃতির পূর্বাভাস অনেক সময় ওর অনুভূতিতেও ধরা পড়ে। গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, জানে বিপদ হবে। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, শির শির করে উঠলো ঘাড়ের পিছনটা

-ডাইভ দিলো রানা, স্নাইপারের বুলেট একটুর জন্যে ছুঁতে পারলো না ওকে। এ-ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছে ওর জীবনে।

'যে-লোক সব সময় নেশা করে থাকে, তার বেলায় এটা ঘটে কিভাবে?'

'সব সময় নেশা করে বলেই তো ব্যাপারটা তার কাছে ধরা পড়ে,' জবাব দিলো উইণ্টার।

অদ্ভুত ব্যাপার, কথাটা রানা বিশ্বাস করলো। ওর তাইওয়ানিজ ওস্তাদ আফিম খায়। মার্শাল আর্ট-এর শ্রেষ্ঠ যে-ক'জন ব্যক্তিত্বকে চেনে ও, তাদের অনেকেই নেশাখোর। এমন হতে পারে মস্তিষ্কের ডান ও বাম অংশের মাঝখানের ব্যারিয়ারটাকে ছোটো করে ফেলে ড্রাগ, ফলে কৌশলটা কাজ করে। অব্যবহৃত টেপ আর খালি মাথা এখানে সমার্থক, দুটোতেই ভালোভাবে বার্তা রেকর্ড করা যায়। ড্রাগ যে একটা অবলম্বন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ড্রাগ যাদের জন্যে দরকারী তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওটার সাথে আরো যে-সব খারাপ উপসর্গ দেখা দেয়, তার জন্যে। 'সান সালভাদরে কি করছিলে তুমি?' উইণ্টারকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'অদ্ভুত এক দল লোকের সাথে কথা বলছিল লজেন,' বললো উইণ্টার। 'একজনেরও চোখ দেখা যায়নি। রঙিন চশমা খুললে তাদের অনেককেই আপনি হয়তো চিনতে পারতেন।'

'কারা তারা?'

'সবাই কনডর-এর লোক, হিটার। লজেনকে তারা পছন্দ করে। বড়সড় একটা বিদেশী সাহায্য নিয়ে কথা বলছিল সে। কয়েক মিলিয়ন ডলার। ওই টাকায় লেটেস্ট ইকুইপমেণ্ট কিনতে পারবে তারা, লোক-জনের আরো বেশি ক্ষতি করতে পারবে। সাহায্যটা পেলে ফোর্ট

লডারডেল-এ নিজেদের একজন লোককেও পাবে, যদি চাওয়া হয়। এল সালভাদরের প্রকৃত নাগরিক তোমরা, তোমাদের হয়তো সত্যি ওটা দরকার।'

'টাকার বিনিময়ে কি আশা করছিল ভিক্টর?'

'বিবেচনা,' বললো উইন্টার। 'সমর্থন। তার সাথে হয়তো একটা ট্র্যান্সশিপমেন্ট পয়েন্ট।'

রানা বললো, 'নিকারাগুয়েতে, সমোজা-র আমলে ভালোই সুবিধে করে নেয় সিনর সাঁতেলা। তার এক আত্মীয়, মুয়েলার, ওখানে দোকান খোলে।'

'নিকারাগুয়াতে এখনো তৎপর ভিক্টর,' জানালো উইন্টার, বুঝতে পারলো রানার আগ্রহ বাড়াতে পেরেছে। 'ঠিক কার সাথে ব্যবসা করছে জানতে পারিনি, তবে ধনী কোনো রাজনীতিক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। ডানপন্থী কোটিপতি আর বামপন্থী কোটিপতির মধ্যে পার্থক্য কি দেখান আমাকে, আমি আপনাকে উড়ন্ত খরগোশ দেখাবো।'

কথাটা মনে গেঁথে রাখলো রানা, সময় ও সুযোগ মতো ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে জানাতে হবে। কনডরদের সম্পর্কে ওয়াশিংটনে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না, কারণ ডানপন্থী ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ হিসেবে পরিচিত তারা, মার্কিনীদের পক্ষে কাজ করে। কনডরদের ডেথ-স্কোয়াডও বলা হয়। 'মুয়েলারদের সম্পর্কে কি জানো তুমি?' হঠাৎ করে জানতে চাইলো রানা।

'আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, কিছুই না।'

'ওরা ছিলো দুই ভাই,' বললো রানা। 'ববি আর রলফ। কলম্বিয়া থেকে সরে নিকারাগুয়াতে যায় ওরা, সত্তর দশকের দিকে।'

'হবে হয়তো একজোড়া খচ্চর, তা না হলে নিকারাগুয়াতে যায়!

আপনি কখনো গেছেন ওখানে ?'

'না।'

'আহ্, মানাগুয়া শহরটা যদি দেখতেন! বছর পনেরো আগে কাত হয়ে পড়ে যায় ওটা—আরেক ভূমিকম্পে। পরে কেউ আর ওটাকে খাড়া করার চেষ্টা করেনি। গোটা দেশটাই বরবাদ হয়ে গেছে। অর্ধেক দায়ী বিদ্রোহীরা, বাকি অর্ধেকের জন্যে আপনি প্রকৃতিকে দায়ী করতে পারেন।'

'তা সত্ত্বেও কিছু লোক মনে করে জায়গাটা মন্দ নয়,' বললো রানা।

'গোমূর্খ লোকের অভাব নেই দুনিয়ায়। শুনতে চান তো বলি নিকারাগুয়া কেমন জায়গা। ওদের মিষ্টি পানিতেও হাঙর আছে।'

'আইলাস দ্য মেইজে মুয়েলারদের কোকেন ব্যবসা ছিলো,' বললো রানা। 'তুমি জানো না দেখে অবাক হচ্ছি আমি।'

'সত্তরের দশকে, তাই না ?' হিসেব কষার জন্যে খানিকটা বিরতি নিলো উইন্টার। 'জনাব, আপনি সুদিনের কথা বলতে চাইছেন। বিলাসবহুল স্যুইটে উলঙ্গ নৃত্যানুষ্ঠানে ব্যবসার চুক্তি হতো। বিজনেস আর প্লেজার, কোনো পার্থক্য ছিলো না। হুমকি না, বোমাবাজি না। সবাই প্রফুল্ল। ইহুদি তরুণরা মায়ামি সৈকতে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা বাগাতো। একটা সময় গেছে বটে। আপনি বলছেন, মুয়ে-লাররা তখন নিকারাগুয়ায় ? তো কি হলো ?'

'কোকেন ব্যবসাটা জোরেশোরে কবে শুরু করলো লজেন ?'

'বছর দশেক আগে, আমার ধারণা।'

'কোকেন ব্যবসাকে আড়াল করার জন্যে আইনসম্মত ব্যবসা, যেমন ব্যাংকিং, অ্যাড-ফার্ম ইত্যাদিতে ঢুকলো কবে ?'

'কিছুদিন পরই।'

যোগাযোগটা এখানেই কোথাও হবে, ভাবলো রানা। সময়টা মেলে, দুই পরিবারের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিলো, ছিলো পেশাগত দক্ষতা। হঠাৎ মনে পড়লো রানার, হণ্ডুরাস আর নিকারাগুয়াতে কন্ট্রা বিদ্রোহী-দের টাকা আর অস্ত্র যোগান দেয়ার সময় মুয়েলাররা তাদের মায়ের নাম ব্যবহার করেছিল। নিজেদের তারা রলফ আর ববি ডেল বলে পরিচয় দিতো। 'ডেল ভাইদের সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

এক মুহূর্ত কিছু বললো না উইন্টার, তার মাথার পিছনে ফ্লাইট হেলমেট স্থির হয়ে থাকলো। তারপর বললো, 'অনেক আমেরিকানের নাম থাকে ডুরান ডুরান, সে-ধরনের কারো কথা বলতে চাইছেন?'

'রলফ আর ববি ডেল,' বললো রানা। 'যে-কোনো কারণেই হোক মুয়েলার নামটা ত্যাগ করে তারা।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নামলো, উইন্টার যেন দম বন্ধ করে বসে আছে। এক সময় একটা শব্দ হলো ইন্টারকমে, সেটা যান্ত্রিকও হতে পারে।

রানা বললো, 'ওদের সম্পর্কে বলো, উইন্টার।'

'আমি শুনেছি ওরা নাকি···ফ্রিডম ফাইটারদের সাহায্য করছিল,' ভেবেচিন্তে জবাব দিলো উইন্টার।

'তা আমি জানি।'

'তাহলে আমি যা জানি, আপনিও তাই জানেন।'

'উঁহুঁ,' বললো রানা। 'তবে জানবো।'

রানা কি বাড়াবাড়ি করে ফেললো? পরে ওর মনে হয়েছে, উইন্টারের জীবনটাকে ওভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা উচিত হয়নি। আসলে ঠিক সে-সময় সঙ্গত কারণেই প্রচণ্ড রেগে ছিলো ও।

কো-পাইলটকে বললো, 'ওভার টু ইউ।' তারপর স্ট্র্যাপ, বাঁধন ইত্যাদি সহ চেয়ার থেকে হ্যাঁচকা টানে 'তুলে আনলো উইন্টারকে,— ফেলে দিলো হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে নিচে। ঝুলতে থাকলো সে, চপার নিয়ে এক হাজার ফুট ওপরে উঠে এলো কো-পাইলট। এই উচ্চতায় ছ'মিনিট থাকলো ওরা।

প্রথম পনেরো সেকেণ্ডের মাথায় উইন্টার জানালো, মুখ খুলতে রাজি আছে সে। তাতেও সন্তুষ্ট হলো না রানা। সত্যি কথা শুনতে চায় ও। আতংকে চিৎকার জুড়ে দিলো উইন্টার, সেটার মাত্রা লক্ষ্য করে রানা বুঝলো লোকটার স্বভাব বেশ খানিকটা বদলেছে। কো-পাইলটের সাথে চোখাচোখি হতে হাসলো ও, টেনে তুলে আনলো উইন্টারকে।

এরপর তাৎপর্যপূর্ণ কথাবার্তা হলো ওদের মধ্যে। কাঁপুনি ধরে গেছে উইন্টারের। দু'জনের সম্পর্ক যে বদলে গেছে, হাড়ে হাড়ে টের পেলো সে। আগে সে ধারণা করেনি, প্রয়োজনে রানা তাকে খুন করতে পারে। এখন বিশ্বাস করে।

জানা গেল, ববি ডেলকে চেনে উইন্টার। সান সালভাদরের কনডর মিটিং-এ উপস্থিত ছিলো ববি। না, তার স্ত্রী (লিলিয়ান) সাথে ছিলো না। ববির স্ত্রী আছে, সে নারী, শুনে বিস্মিত হলো উইন্টার। তার ভাষায়, ববি ডেল অন্য রকম রুচির মানুষ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠিক কি ধরনের ভূমিকা বা অবদান রাখতো ববি ডেল উইন্টার কোনো দিনই তা বুঝতে পারেনি। সাথে একজন দেহরক্ষী নিয়ে মিটিঙে হাজির হয় সে—সালভাডোরান, সন্দেহ নেই। ভিক্টর তার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা দেখায়। এটা একটা ব্যতিক্রম বলা যায়, খুব কম লোককেই শ্রদ্ধা করে ভিক্টর।

মিটিংে তারা উইন্টারকে থাকতে দেয়নি। কি নিয়ে আলোচনা হয় জানতে পারেনি সে। মিটিংে ছিলো একজন পানামানিয়ান, তিনজন সালভাডোরিয়ান, একজন অচেনা লোক (সম্ভবত কণ্ট্র। বিদ্রোহীদের নেতা-টেতা হবে), কঠোর প্রকৃতির একজন আর্জেণ্টাইন, দু'জন কিউবান, একজন আমেরিকান। আমেরিকান লোকটার অদ্ভুত চেহার এখনো পরিষ্কার মনে আছে উইন্টারের, দেখে মনে হবে লোকটা আবর্জনা খেয়ে বেঁচে আছে।

'লোকটার কি কালো চুল, গলার কাছে ঝুলে আছে চামড়া?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আপনি তাকে চেনেন?'

'তার সাংকেতিক নাম কি শকুন?'

'আমরা গোপন তথ্য বিনিময় করিনি,' বললো উইন্টার। 'তবে নামটা অর্থবহ। কনডর মানেই তো শকুন। ব্যাপারটা আসলে কি, সে-ই কি সংগঠনটাকে খুঁজে বের করে?'

'হতে পারে।'

'দেখে কিন্তু তাকে অতোটা যোগ্য বলে মনে হয়নি আমার। আমি হয়তো তাকে ভুল বুঝেছি।'

উইন্টার প্রথম বা শেষ ব্যক্তি নয়, ডেভিড গোল্ডব্লাটকে আরো বহু লোক ছোটো করে ভেবেছে। ডেভিড গোল্ডব্লাট ওরফে কনডর ওরফে শকুন পশ্চিম গোলার্ধের বহু অপরাধের সাথে জড়িত। বে অভ পিগস, চিলি, এল সালভাদর, সব জায়গায় সে তার কলংকের চিহ্ন রেখেছে লিলিয়ানের বস্ ছিলো সে, পরে ববিরও বস্ হয়।

ডেভিড গোল্ডব্লাট মানে সি. আই. এ.। বিশেষ অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে নষ্ট করছে সে, এই সময়ে

তাকে ধরে ফেলে রানা। তাকে খুন করেনি বলে নিজের ওপর এখনো রেগে আছে ও। সুযোগ পেয়েও নেয়নি ও। 'তুমি বলেছো, এই লোকগুলোকে চাঁদা দিচ্ছিলো লজেন।'

কাঁধ ঝাঁকালো উইন্টার, যার কোনো অর্থ করা গেল না। 'চাঁদা বোধহয় কঠিন একটা শব্দ।'

কর্নেল বেনিন আর কালভিন বলেছে, সি. আই. এ.-র ভেতর ঢুকে পড়েছে কার্টেল। 'তুমি কি করে জানলে, সত্যি সত্যি টাকাটা দিয়েছে ওদেরকে লজেন?'

'সে নিজেই আমাকে বলেছে,' জানালো উইন্টার। 'লজেন আমাকে বললো, আই বট মাইসেলফ সাম ওভারসাইট।'

'ঠিক এই ভাষায়?'

'সত্যিকার ভালো ইংরেজি জানে সে। যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ থেকে একজোড়া ডিগ্রী নেয়া আছে তার।'

'হিপ্পি হবার পরের ঘটনা?'

'হ্যাঁ, বোধহয়।'

'আরিজোনা ইউনিভার্সিটি থেকে।'

'হ্যাঁ।'

রানা ভাবলো, কে জানে সন্দেহ না করে লজেন কিংবদন্তীর আর কোন্ অংশ বিশ্বাস করেছে উইন্টার। সে নিজের চোখে দেখেছে ও নিজের কানে শুনেছে, এগুলো ছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করা উচিত হবে না। 'লজেন আর ববি ডেল সম্পর্কে আর কি জানো তুমি?'

'আর কিছু জানি না।'

'তুমি সহযোগিতা করছো না, উইন্টার। আমাদের লেফটেন্যান্ট পাইলট হিসেবে অত্যন্ত ভালো। উপযুক্ততা প্রমাণ করতে না পারলে

তোমাকে আমরা সাথে রাখবো না।'

খোলা দরজা দিয়ে নিচে তাকালো উইন্টার। মেঘের ভেতর ঢুকেছে চপার, এই ঘন কালো মেঘ দু'দিন ধরে মুড়ে রেখেছে বোগোটা আর আশপাশের মালভূমিগুলোকে। নিচে রয়েছে আলু, তামাক, আর আখ খেত। এতো ওপর থেকে কাউকে ফেলে দিলে, ভিজে মাটিতে সেঁধিয়ে যাবে দেহটা। ধরে নেয়া হবে, আরেকজন ককেরস, এটার গায়ে শুধু ফ্লাইট স্যুট। 'শুনুন, ব্যাপারটার কোনো গুরুত্ব নেই,' বললো উইন্টার। 'এই ডেলের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তার সাথে এখন আর কারো কোনো সম্পর্ক নেই। সে মারা গেছে। শুধু তার পরিবারের জন্যে মৃত্যুটা একটা বিষয়। ভিক্টর লজেন ওই পরিবারের একজন সদস্য।'

'কাকে কবর দেয়া হলো?' স্বগতোক্তি করলো উইন্টার, যেন হঠাৎ করে ঘটনাটা মনে পড়ে গেছে তার। 'ওটা তাহলে ববি ডেলের লাশ ছিলো। প্রায় একমাস আগের ঘটনা।'

'একটু ভুল হলো।'

'তিন কি চার হপ্তা আগে,' বললো উইন্টার। 'আমার মনে পড়ছে। সান্তা মারিয়া থেকে লজেনকে নিয়ে গেলাম আমি।'

'তাহলে মুয়েলার এস্টেটেও গেছো তুমি?'

'ওখানে আট শো গজ লম্বা একটা ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ আছে, হাসিয়েনদা থেকে মাইলখানেক দূরে। বিশ্বাস করবেন, ওটা মর্টার ইমপ্লেইসমেণ্ট দিয়ে ঘেরা?'

'শুনেছি জায়গাটা নাকি ভারি সুরক্ষিত।'

হেলমেটের ভেতর মাথা ঝাঁকালো উইন্টার। 'সবখানে ফিফটি-ক্যালিবার বুলেটপ্রুফ কাঁচ দেখতে পাবেন, এমনকি শাওয়ারেও।'

'ওখানে গিয়ে কাদের দেখলে তুমি?' জানতে চাইলো রানা।

'গোটা পরিবারকে,' বললো উইন্টার। 'ভিক্টরের বুড়ো মা-বাবা। বোন। আর, অবশ্যই ডেলরা। মা, ভাই, বড়ো কর্তা। দু'জনকেই ওদের রলফ বলে ডাকা হয়।'

'ওদের সম্পর্কেই জানতে চাই আমি।'

'ছেলেটা, রলফ, তার ভাই, যে মারা গেছে, দেখতে ববির মতো নয়। প্রায় কালোই বলা যায় তাকে, মা-মামাদের রঙ পেয়েছে। ঠিক অলস বলবো না, তবে একটু ঢিলেঢালা। চোয়ালে বেশ বড় একটা কাটা দাগ আছে, বোধহয় আড়াল নিতে দেরি করায় আহত হয়েছিল।'

ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে, ভাবলো রানা। হণ্ডুরাস আর নিকারাগুয়াতে কন্ট্রাদের সাথে যুদ্ধ করছিল রলফ ডেল। রানার ধারণা ছিলো, ছোকরা বোধহয় এতোদিনে মরে গেছে। নিজেদের কেলেংকারী ঢাকার জন্যে, যেটা শিগগিরই প্রকাশ না পেয়ে পারে না, তাকে সি. আই. এ.-র মেরে ফেলারই কথা। 'আর বুড়ো কর্তা?'

'জার্মান ভদ্রলোকের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করলো উইন্টার।

জার্মান। নাৎসী। গেস্টাপো প্রধান। 'হ্যাঁ,' বললো রানা।

'ভদ্রলোক হ্যালো বললেন অদ্ভুত ভারি গলায়,' এমন অবাক হয়ে তাকালো উইন্টার, যেন বিস্ময়ের ঘোরটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। 'তবে তাঁর সাথে আলাপ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার অবস্থান তো আর বৃত্তের ভেতর ছিলো না। লক্ষ্য করলাম, বেশিরভাগ সময় দুই বুড়ো ফিসফাস করছেন—তিনি আর সাঁতেলা। ওদেরকে দেখে আমার মনে হলো, যেন এ দুনিয়ার মানুষ নন। বিশেষ করে জার্মান ভদ্রলোকের মধ্যে কি যেন একটা আছে…ঠিক সম্মোহনী শক্তি

নয়, তবে একটা ভয়ানক অলৌকিক ব্যাপার, ভদ্রলোক যেন যমদুত, গা ছমছম করে। কেউ যেচে পড়ে তাঁদের সাথে কথা বললো না। এমনকি ভিক্টরও তার মুখ বন্ধ রাখলো। সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে আমাকে জার্মান ভদ্রলোকের চোখ দুটো। এই চোখ জীবনে খুব বেশি আপনি দেখেননি, জঙ্গলের বাইরে তো কখনোই দেখেননি। ঠিক যেন একটা সাপের চোখ।'

'আমি শুনেছি, ববিকে কবর দেয়া হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি করে এস্টেট ছেড়ে চলে যান তিনি।'

'হতে পারে,' বললো উইন্টার। 'বুড়িকে আমি মাল-পত্র গুছিয়ে স্যুটকেসে ভরতে দেখেছি। তবে, কি জানেন, আপনার বন্ধু, বুড়ো জার্মান, তাঁর কোথাও বা কারো কাছ থেকে সরে যাবার দরকার করে না। সবাই বরং তাঁর কাছ থেকে সরে যায়, কারো যদি নিজের মঙ্গল বোঝার ক্ষমতা থাকে।'

'মনে হচ্ছে তুমি খুব প্রভাবিত হয়েছো।'

'দুর্লভ বলবো? মোটকথা, এ-ধরনের মানুষ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আপনি যখন কোনো লোককে চপার থেকে ফেলে দিতে যান, আপনার চেহারা আর চোখ কেমন হয়? তাঁর মধ্যে ঠিক সেই জিনিস দেখেছি আমি, ভাবটা স্থির হয়ে আছে চেহারায়।'

রানা হাসলো না। বুঝতে পারলো, এই লোককেই খুঁজছে ও। হেনেরিক মুলারকে পাওয়া গেছে। এখনো তার হদিশ পাওয়া যায়নি, তবে অস্তিত্ব জানা গেছে।

# চার

এল ডোরাডো এয়ারপোর্টের সামরিক হ্যাঙ্গারে টমাস কালভিনের একটা মেসেজ পেলো রানা। কমার্শিয়াল ফ্লাইটে চড়ে আসছে সে, রানা যেন কোথাও না যায়।

মেসেজটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে না পারলেও, যোগ্য পেশাদার-দের ওপর সব সময় আস্থা রাখে রানা, বিশেষ করে জানা আছে উপ-যুক্ত কোনো কারণ ছাড়া কালভিন কিছু করে না। কলম্বিয়ার পরিবেশ গরম হতে শুরু করেছে, কখন কি ঘটে যায় কিছুই বলা যায় না। কাল-ভিন হয়তো কোনো খবর পেয়ে রানাকে নড়াচড়া করতে নিষেধ করে দিয়েছে।

বৃষ্টির মধ্যে ল্যাণ্ড করেছে ওদের চপার। অপেক্ষার সময়টাও বৃষ্টির মধ্যে কাটলো। বেশ খানিকক্ষণ পর ল্যাণ্ড করলো ডি. এ. এস.-এর প্লেনটা, সিঁড়ি বেয়ে একা নেমে এলো কালভিন। ধূসর রঙের একটা রেইনকোট পরে আছে সে, নিতান্ত গরীব ছাড়া সবাই এটা পরে বোগোটায়। 'রানা, দোস্ত, এই শালার বৃষ্টি···।' শুরু করলো সে।

'সমস্যাটা কি, টমাস?' প্রসঙ্গ তুললো রানা।

ডে-রুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গা ঝাঁকিয়ে পানি ঝাড়লো কালভিন। 'লজেন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে,' বললো সে, চেহারায় খুশির কোনো ভাব নেই

'কেউ তাকে দেখেছে ?'

'কেউ নয়, হাজার হাজার লোক।'

'বুঝলাম না।'

'ওখানে তোমার থাকা উচিত ছিলো,' তিক্তকণ্ঠে বললো কালভিন। বোগোটায় টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে, লজেনের টিমও অংশ নেবে। আজ রাতে তারা মেডিলিন থেকে রওনা হলো। খেলোয়াড়দের নিয়ে টেক অফ করবে প্লেন, এই সময় কালো একটা হেলিকপ্টার দেখা গেল আকাশের কোণে। প্লেনের পঞ্চাশ গজের মধ্যে ল্যাণ্ড করলো সেটা। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো লজেন। সাদা গামা ইউনিফর্ম পরে ছিলো সে—খাকি শার্ট, নীল প্যান্ট, বেরেট। ক্যাপটেনের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলো, টিমের সাফল্য কামনা করে মদ খেলো, ফিরে গেল চপারে। সব মিলিয়ে নব্বুই সেকেণ্ড ছিলো। সে কে, লোকজনকে শুধু এইটুকু বোঝার সুযোগ দেয়ার পর চলে গেল। যাবার সময় আকাশ থেকে রাজনৈতিক বক্তব্য ছাপা কিছু প্রচারপত্র ছড়িয়ে গেল।'

'কেউ অনুসরণ করেনি ?'

'সময় পেলে তো,' বললো কালভিন। 'ফোন করে কর্তৃপক্ষকে জানানো হলো, কিন্তু ততোক্ষণে মেডিলিন ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে সে।'

'চপারটা সম্পর্কে কিছু জানা গেছে ?'

'রাডারে একটা ব্লিপ ধরা পড়েছে, উপত্যকা ধরে দক্ষিণ-দক্ষিণপুব দিকে যাচ্ছে। স্ক্রীনের একেবারে নিচের দিকে ছিলো ব্লিপটা, মাঝে

মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছিলো। তিরিশ মাইল পর আর দেখা যায়নি।'

দক্ষিণ-দক্ষিণপুব, ভাবলো রানা। মনে পড়লো, মুয়েলার এস্টেটটা ওদিকেই। তবে কালভিনের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার মনে হয়নি, লজেন কি যেন বলার চেষ্টা করছে আমাদের?'

'বিদ্রূপ করছে?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'আসলে পাল্টা আঘাত হানছে, রানা,' বললো কালভিন। 'লিফলেটে কি ঘোষণা করা হয়েছে জানো? এক্সট্রাডিশন চুক্তি বাতিল করার দাবিতে একদিনের হরতাল আহ্বান করেছে সে, হরতালের সময় বিক্ষোভ মিছিল আর সমাবেশও হবে। এয়ারলাইন বন্ধ করার জন্যে সরকারকেও নানা ধরনের হুমকি দিয়েছে।'

'কি ঘটবে বলে মনে করো?' জানতে চাইলো রানা। 'হরতাল ডেকে রাস্তায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবে সে?'

'রাজনীতিকরা তাই আশংকা করছেন। ডি. এ. এস. বলছে, হতে পারে।'

'সরকার কিভাবে নিচ্ছে ব্যাপারটা?'

'ঠিক জানা নেই,' বললো কালভিন। 'কর্নেল বেনিন বলছেন, তাঁরা লজেনকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন।'

'এক্সট্রাডিশন চুক্তিটা কোন পর্যায়ে আছে জানো?'

ভিজে রেনকোটের ভেতর অস্বস্তির সাথে নড়ে উঠলো কালভিন। 'আমাকে বলা হয়েছে, চুক্তিটা পুরোপুরি অনুমোদন করেছে কোর্ট। বাকি আছে শুধু প্রেসিডেন্টের সই।'

'চমৎকার,' বললো রানা। 'আমরা এখন কি করবো?'

'ফিরে যাবো মেডিলিনে।'

'ভেবো না তাকে আমরা রাস্তা-ঘাটে দেখতে পাবো। অতো বোকা সে নয়।'

'তুমি বলতে চাও ফুটবল টিমটাকে বিদায় জানাতে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে তার?'

'ঠিক সময়মতো পালিয়ে যেতে পারায় ব্যাপারটাকে তোমার ব্রিলিয়াণ্ট বলতে হবে।' এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। 'তবে তোমার কথাই ঠিক। মেডিলিনেই ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। যেখানেই থাকুক সে, শহর থেকে খুব বেশি হলে দু'ঘণ্টার পথ।'

'দু'ঘণ্টার পথ মানে কয়েক শো মাইলও হতে পারে,' বললো কালভিন।

'পারে।'

মেডিলিনের আশপাশে বেশ কয়েক জায়গায় হানা দিয়েও ডি. এ. এস. লজেনের কোনো হদিশ করতে পারেনি। পরে জানা গেছে, যেখানে তাকে আশা করা হয়নি ঠিক সেখানেই ছিলো সে। উইণ্টারের কথা অনুসারে, শান্ত পরিস্থিতিতেও মাঝে মধ্যে দু'একদিন পরপর আস্তানা বদল করে লজেন। এখনকার যে পরিস্থিতি, হয় সে সারাক্ষণ চলার মধ্যে থাকবে, নয়তো এমন কোথাও গা-ঢাকা দেবে যেখানে খোঁজার কথা কেউ ভাববে না।

লজেন কোথায় থাকতে পারে সে-ব্যাপারে রানার একটা ধারণা আছে, তবে উইণ্টারের কাছ থেকে উদ্ধার করা তথ্য কালভিনকে জানাবার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। এ-ব্যাপারটায় ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির কোনো ভূমিকা নেই। ভূমিকা আছে শুধু রানার।

তদন্তটা কোন্‌দিকে এগোচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। মুলার আর

লজেন কাছাকাছি, এক হতে যাচ্ছে। দু'জনে যদি মেডিলিনের আশ-পাশে কোথাও ঘাঁটি গাড়ে, ঘাঁটিটা কোথায় হবে আন্দাজ করতে পারে রানা। তবে সেখানে যেতে হলে প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ওকে, কারণ সামরিক এয়ারক্রাফট লাগবে ওর। কো-পাইলট, লেফটেন্যান্ট নাসাউ ওর পিছনে থাকবে হেলিকপ্টার নিয়ে।

ঠিক হলো, ওদের সাথে উইন্টারও মেডিলিনে যাবে। রানা আর নিজেকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় কালভিন। উইন্টারকে মেরে ফেলা হতে পারে, এই ভয়টা ছাড়ছে না তাকে। তাছাড়া, অন্য কারণও আছে। উইন্টারের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্যে প্রতিদিন নিয়মিত খানিকটা করে কোকেন সরবরাহ করছে ওরা। ড্রাগে অভ্যস্ত সে, হঠাৎ করে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তবে যতোটা তার দরকার তারচেয়ে অনেক কমই দিচ্ছে ওরা। রানা এখন এটাকে পুঁজি করে সুযোগ নিতে চাইছে।

'সাপ্লাই বন্ধ করে দিলে মারা পড়বে লোকটা,' আপত্তি জানালো কালভিন। 'এমন অসুস্থ হয়ে পড়বে যে কোনো কাজেই লাগবে না।'

'আমরা কেন সাপ্লাই বন্ধ করবো,' বললো রানা। 'তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে, তার সাপ্লাই সে নিজেই বন্ধ করছে। কার্টেল সম্পর্কে এমন কিছু নেই যা সে জানে না, টমাস। বাধ্য করা না হলে একবারও মুখ খোলেনি ব্যাটা। চপার থেকে যখন ফেলে দিলাম, তখন যদি তুমি ওর চেহারা দেখতে! চিৎকার করছিল, কিন্তু একটুও ভয় পায়নি।'

'তুমি তাকে চপার থেকে ফেলে দিতে যাচ্ছিলে?'

মৃদু হেসে রানা বললো, 'বেরিয়ে যাবার সময় দরজার ফ্রেম ধরে

ফেলে সে।'

'যীশু, যীশু। তাকে আমাদের দরকার, রানা। উইন্টারের কিছু হলে কর্নেল বেকায়দায় পড়বেন।'

'কর্নেল বেনিনের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে,' বললো রানা। 'কাল রাতে টেলিভিশনে সেই টেপটা দেখলাম। এককথায়, অপূর্ব। সাড়ে তিন মিনিটে অবিশ্বাস্য বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন তিনি।'

'দেখে যা মনে হচ্ছে, তাঁর অবস্থা অতোটা ভালো নয়,' বললো কালভিন। 'প্রচার মাধ্যমে হয়তো ভালোই করছেন, কিন্তু তাঁর জন্যে দুশ্চিন্তায় আছি আমি। নিজেকে নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা বদলে গেছে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিকটা আগের মতো খেয়াল করছেন না।'

'ভদ্রলোক বোকা নাকি! তিনি জানেন না ভিক্টর পাল্টা আঘাত হানছে?'

'তিনি একা নন, অনেক লোকই বোকার মতো আচরণ করছে,' বললো কালভিন। 'কোনো তদন্তে আকস্মিক অগ্রগতি হলে এরকম ঘটে। সবাই ভাবছে, যুদ্ধে আমরা জিতে গেছি। অথচ যুদ্ধ এখনো শুরুই হয়নি।'

'উইন্টারকে কোকেন দেয়া বন্ধ করে দাও, টমাস। কার্টেলের বিরুদ্ধে কিছু যদি করতে চাও, এছাড়া পথ নেই।'

'তুমি ভাবছো কুকুরটাকে হাড্ডি যোগান দিতে ভালো লাগছে আমার?'

'কোকেনের জন্যে তোমার পায়ে গড়াগড়ি খাক সে।'

মাথা নাড়লো কালভিন। তার মাথা নাড়ার অর্থই হলো অনিচ্ছার সাথে রাজি হওয়া। 'ঠিক আছে। তবে কাজটা আমি করছি শুধু এই

জন্যে যে একটা কিছু দিয়ে বুঝ দিতে না পারলে ওয়াশিংটন আমাকে ডেকে পাঠাবে।'

'সত্যি নাকি ?'

'আমি বার্ন-এর জঙ্গলে শিকার করছি,' বললো কালভিন। এড-ওয়ার্ড বার্ন হলেন ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির স্থানীয় ডিরেক্টর। 'যতোক্ষণ তাজা মাংস আনতে পারবো ততোক্ষণ সব ঠিক থাকবে। সাপ্লাই বন্ধ, আমারও হাত-পা নাড়া শেষ।'

'বার্নকে আমি পছন্দ করি না,' বললো রানা।

'রানা, তাঁর সাথে মাত্র একবার দেখা হয়েছে তোমার। মানুষ হিসেবে তিনি ভালো।'

'তোমার এই বার্নই তো জ্যাক মরিসকে দায়িত্ব দিয়ে ফিল্ডে পাঠিয়ে-ছিল,' বললো রানা। 'বয়স কম, ভালো করে পরীক্ষাও করা হয়নি। এরজন্যে কাকে তুমি দায়ী করবে ? আমেরিকায় হলে ছোকরা হয়তো দলবদল করতো না, কিন্তু বিদেশে, বিশেষ করে কলম্বিয়ার মতো নরকে সে যে বিপথে যেতে পারে এটা বার্নের বোঝা উচিত ছিলো।'

কাঁধ ঝাঁকালো কালভিন। 'কেউ আমরা নির্ভুল নই।'

কথাটা ঠিক, এমনকি লালচুলো পাইলটদের জন্যেও। কোকেন দেয়া বন্ধ করা হয়েছে, এই খবরটা ভালোভাবে নিলো না উইণ্টার। ঘণ্টা-খানেক গুম হয়ে থাকলো সে, তারপর সবাইকে একঘেয়েমিতে ভরে তুললো অর্থহীন হুমকি দিয়ে। ডে-রুম কাউচে বসে ঘুমোবার চেষ্টা করলো রানা, তন্দ্রার মধ্যেও শুনতে পেলো উইণ্টার প্রলাপ বকছে। প্লেনে চড়ার আগে তিন ঘণ্টার মতো সময় পাওয়া গেল চোখ বোজার।

বোগোটায় বৃষ্টিকে ফেলে এলো প্লেন, উঠে এলো মেঘের ওপরে। প্লেন সিধে হবার পর নেভিগেটরের সীটে বসে রেডিও অন করলো

রানা। সব ক'টা স্টেশন থেকে প্রচার করা হলো ফুটবল টিমের মাঝখানে লজেনের উপস্থিত হবার নাটকীয় ঘটনাটা। বেসরকারী ব্যবসায়ে সরকারী নাক গলানোর ব্যাপারে তার অভিযোগ টেপ থেকে বাজিয়ে শোনানো হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও কলম্বিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর জন্যে অভিযুক্ত করেছে সে। দাবি জানিয়েছে, এক্সট্রাডিশন চুক্তি এই মুহূর্তে বাতিল করতে হবে। হুমকি দিয়ে বলেছে, তা না হলে ফল ভালো হবে না। হুমকি দিলেও, কি করতে পারে সে বা করার কথা ভাবছে, সে-সম্পর্কে কোনো আভাস দেয়নি।

পাহাড়শ্রেণীর শেষ মাথায় পৌঁছে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো প্লেন, ককপিট থেকে আরোহীদের মধ্যে ফিরে এলো রানা। বেল্ট বাঁধা শেষ করেছে মাত্র, সাথে সাথে প্রায় ডিগবাজি খেতে শুরু করলো প্লেন। প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে পড়েছে ওরা। এখন যদি একটা বজ্র ছুটে এসে আঘাত করে প্লেনে, জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে, ভাবলো রানা। সাধারণ আরোহীদের অবশ্য বলা হয়, আধুনিক ইকুইপমেণ্ট থাকায় বজ্রপাতে প্লেনের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে এই পেশায় যারা জড়িত তারা অন্যরকম জানে।

অন্যরকম জানে, স্বভাবতই, গর্ডন উইন্টারও। তবে এই ঝুঁকি নিয়েই সে তার পুরো পরিণত বয়সটা কাটিয়েছে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। আজ অন্য লোকের হাতে প্লেনের কণ্ট্রোল, সে একজন আরোহী মাত্র। তার নিত্য প্রয়োজনীয় কোকেনও অন্য লোকের হাতে। এ-সব ব্যাপারগুলো তাকে অস্থির করে রেখেছে। নাক টানছে ঘন ঘন, হাঁসফাঁস করছে। মেডিলিনের দিকে যখন নামতে শুরু করলো প্লেন, উইন্টারের অবস্থা দাঁড়ালো হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো। এক পুরিয়া কোকেনের জন্যে কাঙালের মতো অনুনয় করলো

সে। চাইলো, কিন্তু পেলো না। প্রতিবার প্রত্যাখ্যান করা হলো তাকে।

যতো নিচে নামলো ওরা, ঝড় আর বৃষ্টি ততোই বাড়তে থাকলো। এরকম আবহাওয়া সবাইকেই অস্থির করে তোলে। রানাও অস্বস্তি-বোধ করছে। দু'বার দমকা বাতাসের মধ্যে পড়ে প্লেনটা এমন ঝাঁকি খেলো, ভয় হলো বুঝি সরাসরি পাহাড়ে গিয়ে আছাড় খাবে ওরা। ফিউজিলাজের চারদিকে বিদ্যুতের লোভী জিভ লকলক করতে লাগলো, রানার চোখে রেখে গেল সাদা-নীল আঁকাবাঁকা ছাপ।

বিদ্যুৎঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে প্লেনটা যখন খাবি খাচ্ছে, নির্দেশ এলো মিলিটারী ল্যাণ্ডিং ফিল্ডের আশা ছেড়ে দিয়ে মেডিলিনের বাইরে কমার্শিয়াল এয়ারপোর্টের দিকে চলে যাও। ঝড়টা ওদিকে কিছুটা কম। অন্তত এরচেয়ে বেশি হবার আশংকা নেই। তাছাড়া অধিকতর দীর্ঘ রানওয়েতে ভুল-ভাল কম হবে।

দিক পরিবর্তনটাও নার্ভাস করে তুললো রানাকে। ডে-রুমে ঘুমোবার সময় একটা স্বপ্ন দেখেছে ও, স্বপ্নের পটভূমিটা ছিলো খোলামেলা একটা জায়গা, যেখানে নিজেকে অসহায় বলে মনে হয়েছে রানার। এয়ারপোর্টে প্লেনটা নিরাপদেই ল্যাণ্ড করলো, কিন্তু স্বপ্নের ভেতর থাকার সময়কার সেই নিরাপত্তার অভাব বোধটা আবার ফিরে এলো ওর মনে।

টার্মিনাল ভবনে ঢুকলো ওরা, অ্যারোভিয়াস-এর স্টলটা দেখতে পেলো রানা, সেই সাথে অনুভূতিটা আরো জোরালো হয়ে উঠলো। স্টলের টিকেট কাউন্টার বন্ধ, তবে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন খুনে। স্টলের সামনে প্রতীক চিহ্ন হিসেবে এমবস করা রয়েছে গামা।

দুটো পিস্তলের কথা ভেবে নয়, রানা উদ্বিগ্ন হলো ভিক্টর লজেনের

কলম্বিয়া জুড়ে মাকড়সার জালের মতো বিছিয়ে থাকা নেটওঅর্ক-এর কথা ভেবে। শুধু এই একটা এয়ারপোর্ট নয়, লজেনকে দেশের সব ক'টা এয়ারপোর্টে ইন্টেলিজেন্স অপারেটর পাঠাতে হয়েছে। তার অতোগুলো আস্তানায় হানা দিয়েও সত্যিকার কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। হয়তো অনেক লোককে হারিয়েছে সে, আরো অনেক লোকের সাথে এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারছে না, কিন্তু টাকা ঢেলে হলেও নিজের কাজ সারার ব্যবস্থা করতে পারছে। সে যদি খুব বেশি টাকা ঢেলে থাকে, সেই সাথে মাসুদ রানা নামের বেয়াদব লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে থাকে, অল্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওদের দলটা।

আগেও এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কলম্বিয়ায় পা ফেলার সাথে সাথে চিহ্নিত করা হয় রানাকে। কিংবা হয়তো তারও কয়েক সেকেণ্ড আগে। এই একই টার্মিনাল ভবনে।

তারপর ইলেকট্রনিক দরজা পেরিয়ে ট্যাক্সি নেয় ও, পিটার পিনেল নামে এক ড্রাইভার ওকে শহরে নিয়ে যায়। কি কারণে যেন রানা ভাবতেও পারলো না সেই একই ঘটনা আজও ঘটবে না। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই দূর থেকে ক্লার্ক গ্যাবল-এর গোঁফ আর গ্যারি কুপার-এর কান দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠলো ওর। বাজি রেখে বলতে পারে ও, পিটার পিনেলের কিছুই বদলায়নি, শুধু টি-শার্টটা ছাড়া, তাতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা রয়েছে, 'শিট হ্যাপেন্স'।

পিটার পিনেল গাড়ি চালায় ভালো, তার '৬৪ মডেলের শেভ্রলে আর ভি-এইট এঞ্জিন অত্যন্ত মজবুত আর শক্তিশালী। ওরা যে এস-কর্ট পাবে হ্যারেরা ফিল্ডে, আধ ঘণ্টা দূরের পথ সেটা।

'সেই একই হোটেল, সিনর?' জানতে চাইলো পিনেল। পুরনো

আরোহীকে পেয়ে ভারি খুশি সে।

'শহরে নিয়ে চলো, পিনেল, বকশিশসহ পঞ্চাশ ডলার পাবে। কালি ফরটি-থি, একটা ওয়্যারহাউসে যাচ্ছি আমরা। পুরনো থিয়েটারের কাছে। ঝুঁকি আছে, পিনেল।'

'গতবারের চেয়ে বেশি, সিনর?'

'বিশ মিনিটের আগে পৌছুতে পারলে সত্তর ডলার পাবে।' রানা জানে, পিনেলকে যেভাবে গাড়ি চালাতে বলছে ও, সেটা ভিক্টর লজেনের সম্ভাব্য আক্রমণের চেয়ে কম বিপজ্জনক হবে না। তবে এছাড়া উপায়ও নেই। হয় ভাড়াটে খুনিদের তাড়া খেয়ে টার্মিনাল ভবনের ভেতর চক্কর খাও, নয়তো পালাও, দুটোর একটাকে বেছে নিতে হবে। দ্বিতীয়টা পছন্দ করলো ও।

পিনেল ওকে নিরাশ করলো না। যীশুকে স্পর্শ করলো সৌভাগ্যের আশায়, প্রেরণা পাবার জন্যে স্যালুট করলো চে গুয়েভারাকে। বিরতি না দিয়ে হর্ন বাজালো সে, একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে টার্মিনাল চত্বরে গাড়ি ঘোরালো, অসংখ্য খুদে বর্শার মতো পানি ছড়ালো চাকাগুলো। পুরনো একটা ফোক্সওয়াগেনের পিছনটা তুবড়ে দিলো শেভ্রলে, ধাক্কা দেয়ার হুমকি সৃষ্টি করে পার্কিং লটে পিছু হটতে বাধ্য করলো আরেকটা গাড়িকে, ঘণ্টায় পঁচাশি মাইল গতিতে উঠে এলো হাইওয়েতে।

'মেরে ফেলবে, নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে।' শিউরে উঠে চোখ মিটমিট করলো উইন্টার।

'সিনর, আপনি উপভোগ করছেন না?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো পিনেল।

'স্পীড একশোয় তোলো,' উইন্টারের কথা ভেবে নির্দেশ দিলো রানা।

'আমার বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র!' রুদ্ধশ্বাসে বললো উইন্টার।

'শান্ত হও,' বললো কালভিন। 'তুমি দুঃস্বপ্ন দেখছো।'

দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরে দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা লুকিয়ে ফেললো উইন্টার। ঠিক সেই মুহূর্তে পানিভর্তি একটা গর্তে পড়লো গাড়ি, শূন্যে উঠে পড়লো ওরা।

'লোকটা কার্টেলের টাকা খেয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, বললো উইন্টার। 'সবাই আমরা মারা যাচ্ছি। কলম্বিয়ার সব ক'টা বন্দুকের নল আমাদের দিকে তাক করা হয়েছে, ফ্রিওয়েতে উঠলেই গুলি খেয়ে মারা যাবো।'

কিন্তু ফ্রিওয়েতে ব্যাপারটা ঘটলো না। ফ্রিওয়ে ছাড়িয়ে আসার পর, দু'মিনিটের মধ্যে, দূরে শহরের আলো দেখা গেল।

'ভিক্টর সম্পর্কে এবার কিছু বলো, উইন্টার,' হঠাৎ তাগাদা দিলো রানা।

'তার সম্পর্কে জানার কথা আপনার একটাই,' রাগের সাথে জবাব দিলো উইন্টার। 'ভিক্টর লজেন আপনাকে খুন করতে যাচ্ছে। তার হাতে আমরা সবাই মারা পড়বো। এভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো মানে আরো তাড়াতাড়ি মৃত্যু ডেকে আনা। দয়া করে আমার কথা শুনুন।'

'তুমি লজেন হলে এই পরিস্থিতিতে কোথায় যেতে?'

'পানামায়,' বললো উইন্টার, জানালা দিয়ে থুথু ফেললো সে। 'সাংকেতিক ভাষায় রেডিও মেসেজ পাঠাতাম। অমুক শালাকে মারো, তমুক শালাকে মারো। ভিডিও গেমের মতো নিরাপদ।'

'কিন্তু লজেন তো যায়নি। এখনো সে কলম্বিয়ায় রয়েছে। তার নিজস্ব সবগুলো জায়গায় খোঁজ নিয়েছি আমরা। যে-সব জায়গায়

ছিলো বলে খবর পাওয়া গেছে, সেগুলোও চেক করা হয়েছে। আমরা জানি, একটা চপার আছে তার। নিশ্চয়ই পাইলটও আছে। তার-মানে, অন্তত কয়েকজন লোক আছে তার সাথে।'

'কমকরেও বারোজন,' বললো উইন্টার, যেন এতোক্ষণে কাজ করছে তার হিসেবী মাথা। 'তার সাথে সব সময় তিনজন গার্ড থাকে, পালা করে ডিউটি দেয় তারা, তারমানে মোট ছ'জন। ছ'জনের মধ্যে কেউ যদি কোনো নিরামিষ রান্নায় দক্ষ না হয়, তাহলে আরেকজনকে ধরুন। ইবানো-কে বাদ দেবেন না। হেড-নকার অর্থাৎ খুনীদের লিডার ইবানোকে বাদ দিয়ে এক পা-ও কোথাও যায় না লজেন। সাধারণত একজন রেডিওম্যানও সাথে থাকে। তারপর ধরুন, পাইলট। আরো লোক থাকতে পারে, পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।'

'তার একটা বড়সড় ঘাঁটি দরকার।'

'জানি কি ভাবছেন,' আকস্মিক উৎসাহের সাথে বললো উইন্টার। 'আপনার মনের কথা আমি ধরতে পেরেছি। এই গাড়ি থেকে বের করুন আমাকে। আমার হাতে একটা প্লেন ছেড়ে দিন। যেখানে আপনি যেতে চান, পৌঁছে দেবো আমি।'

'কি নিয়ে আলাপ করছো তোমরা?' জানতে চাইলো কালভিন।

'একটা আইডিয়া নিয়ে, টমাস।'

'তোমার ভেতর একটা সতর্কতা দেখছি, রানা,' মৃদু অভিযোগের সুরে বললো কালভিন। 'জঙ্গলে বহুবছর ধরে আছো তুমি অথচ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি একটা নবিশ।'

হাসলো রানা। কালভিনকে সব কথা বলতে যাচ্ছিলো ও। বিপদকে পিছনে ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা। ডি. এ. এস.-এর সেফ হাউসটা আর সিকি মাইল দূরে। সামনে একটা চৌরাস্তা।

বাঁকটার ওপর নজর রাখছে রানা, হঠাৎ শেভ্রলের পিছনটা আলোকিত হয়ে উঠলো। ঝট্ করে ঘাড় ফেরালো ও। একজোড়া হেডলাইট, দ্রুতগতিতে কাছে চলে আসছে।

এই সময় ব্রেক কষলো পিনেল।

'পিনেল!'

'সিনর!' পিনেলও চিৎকার করলো, তবে তার আতংকের কারণ পিছনের হেডলাইট নয়। শেভ্রলের দু'দিক থেকে ধেয়ে আসছে দুটো ইয়ামাহা মোটরসাইকেল। চেহারা আর আকৃতি দেখে মনে হলো, ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল বেগে ছুটতে পারে ওগুলো।

টপস্পীডে ছুটে আসছে মোটরসাইকেল আরোহীরা। রানার নির্দেশ পেয়ে আবার গাড়ি ছাড়লো পিনেল। শেভ্রলে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ায় শত্রুরা দিক বদলেছিলো, আবার সেটা চলতে শুরু করায় দ্বিতীয় বার দিক বদলের সুযোগ পেলো না, কারণ ইতিমধ্যে একেবারে কাছে চলে এসেছে তারা। বাম দিকের মোটরসাইকেল ঘষা খেলো শেভ্রলের নাকের সাথে, কেউ যেন হ্যাঁচকা টান দিয়ে শূন্যে তুলে নিলো সেটাকে। ডান দিকেরটা ওদের পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিক দুর গিয়ে থামলো সেটা, বাঁক ঘুরলো, আবার ফিরে আসছে। এই সময় প্রথম মোটরসাইকেল থেকে শুরু হলো গুলিবর্ষণ। কি অস্ত্র ব্যবহার করছে শত্রুরা বোঝা গেল না, তবে বুলেটগুলো এলো প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ঘন ঘন। শেভ্রলের পিছনের কাঁচ বিস্ফোরিত হলো। ডান দিকের জানালা চুরমার হয়ে গেল। চেষ্টা করলে আরো কিছু দেখার হয়তো সুযোগ পেতো রানা, কিন্তু গাড়ির মেঝেতে হঠাৎ করে ভিড় বেড়ে গেছে।

'ব্রেক করো, পিনেল !' নির্দেশ দিলো রানা। 'গাড়ি ঘুরিয়ে ধাক্কা দাও ওটাকে !'

সাথে সাথে সাড়া দিলো পিনেল। পেভমেণ্টে বাড়ি খেলো শেভ্রলের পিছনটা, স্যাঁৎ করে বাঁক ঘুরলো। ঘোরাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই প্রথম মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা খেলো গাড়ি। কর্কশ শব্দ হলো, রী রী করে উঠলো রানার গা। পিছনের ভাঙা জানালা দিয়ে দোমড়ানো মোচড়ানো চাকা দেখতে পেলো ও।

প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, গুলি করছে, সেই সাথে চিৎকার, 'গো! গো! গো!' কারণ দ্বিতীয় বাইকটা ওদের পিছনে চলে এসেছে, সেটার পিছনে সেই গাড়িটা—গতি কমাবার কোনো লক্ষণ নেই। বাইক আর গাড়ি, দুটো থেকেই গুলি আসছে।

ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে ছুটলো শেভ্রলে। গাড়ির ট্রাঙ্ক আর বাম দিকটায় গুলি লেগেছে। ছুটছে ওটা, ওদেরকে ধাওয়া করে আসছে শত্রুরা। পরপর পাঁচটা গুলি করলো রানা। বুঝলো, লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। অনুসরণরত গাড়িটা, ওটা একটা মার্সিডিজ, ফুটপাতে উঠে গেল, কাঁচ ভেঙে ঢুকে পড়লো একটা শো-রুমের ভেতর। উইণ্ড-শীল্ড বলে কিছু নেই ওটার।

প্রায় সেই একই মুহূর্তে অনুভব করলো রানা, পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। সামনে কোনো রাস্তা নেই, শেভ্রলে কোন্‌দিকে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় মোটরসাইকেলটা পাশে চলে এসেছে, গুলি করছে বিরতিহীন। ধাতব আবরণে আঘাত করছে বুলেট, ভেতরে ঢুকে কেড়ে নিচ্ছে তাজা প্রাণ।

কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেলো শেভ্রলে। দ্বিতীয় ধাক্কাটা আরো বড় কিছুর সাথে লাগলো। রানার পায়ের ওপর নেতিয়ে পড়লো

কে যেন। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো রানা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ি। লাফ দিয়ে ফুটপাতে পড়লো রানা। পড়েই এক গড়ান দিয়ে সিধে হলো ফায়ারিং পজিশনে। চারটে গুলি করলো কোনো বিরতি ছাড়াই।

শেষ গুলিটা বাইক থেকে ফেলে দিলো ড্রাইভারকে, বাইকটা পিছলে যাবার ভঙ্গিতে ছুটে গেল আরেকদিকে। সেটাকে লক্ষ্য করে আরো দুটো গুলি করলো রানা। বাইক থেকে ছিটকে পড়লো দুটো শরীর, তারপরও মেশিনটা ছুটছে। রাস্তার উল্টোদিকের একটা পাঁচিলে ধাক্কা খেলো সেটা, থামলো, সেই সাথে থেমে গেল চৌরাস্তার সমস্ত নড়াচড়া।

এতোক্ষণে মানুষের আওয়াজ শোনার সময় পেয়েছে রানা। কুকে-রসরা সবাই স্থির ও চুপচাপ। একবার মনে হলো, রাস্তার উল্টোদিকে, দূর প্রান্তের ছায়ার ভেতর, কে যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে মার্সিডিজটা থেকে দূরে সরে গেল। সঠিক বলতে পারবে না।

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো ও। কোনো গুলি হলো না দেখে সাহস করে শেভ্রলের দিকে এগোলো। গাড়ির ভেতর চিৎকার করছে একজনই, উইন্টার। আক্রমণের পর থেকে সেই যে শুরু করেছে, তারপর আর মুহূর্তের জন্যেও থামেনি সে। যদিও কোথাও জখম হয়েছে বলে মনে হলো না। স্টিয়ারিঙ হুইলটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে পিনেল, যেন ঘুমোচ্ছে সে। নড়ছে না একচুল, কারণ বাঁচার কোনো আশা নেই তার। সবচেয়ে বেশি গুলি খেয়েছে কালভিন। মাথায়, গলায়, আর বুকে। বুকে লেগেছে দুটো গুলি।

# পাঁচ

অপারেশন থিয়েটারে তিন ঘণ্টা ধরে কাটাছেঁড়া করা হলো টমাস কালভিনকে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে রানা উপলব্ধি করলো, ভিক্টর লজেনকে জীবিত ধরতে হবে ওর, ঠিক কালভিন যেমন চেয়েছিল। কালভিনের আশা ছিলো, লজেনকে ধরে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাবে সে, সেখানেই তার বিচার করা হবে। রানা এখন অন্য কিছু চাইতে পারে না। ওর ব্যক্তিগত শিকার, রলফ মুয়েলার ওরফে হেনেরিক মুলারের ব্যাপারটা একটু পরে দেখলেও চলবে।

বাকি হতাহতদের ব্যাপারটা মেনে নেয়া সহজ। বিপদ আছে জেনেই রানার পথ অনুসরণ করেছিল পিটার পিনেল, তার ধারণা ছিলো একটা ভালো কাজ করছে সে। সুস্থ হয়ে ওঠার পর নিজেকে লোকটা তিরস্কার করবে না বলেই রানার ধারণা। তার ডান চোখের পাশটা জখম হয়েছে, ফলে শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা চোখ হারাতে হবে। পাঁজরের একজোড়া হাড় ভেঙেছে, সেটা তেমন কিছু না। হাতে তৈরি হয়েছে একটা ফুটো, সেটাও মেরামতযোগ্য। পেটের অগভীর গর্ত থেকে বের হয়েছে একটা বুলেট।

চোখ বাদ দিয়ে, স্থায়ী কোনো ক্ষতি ছাড়াই সেরে উঠবে সে। জ্ঞান ফেরার পর খুশি হয়ে উঠলো ড্রাইভার, জানতে পারলো, যতোদিন না আবার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামতে পারছে ততোদিন দৈনিক পঁচাত্তর ডলার করে পেতে থাকবে। রানা তাকে আরো বললো, রঙটা পছন্দ করতে পারলেই আরেকটা নতুন গাড়ি কিনে দেয়া হবে তাকে।

একই করিডরের শেষ মাথার একটা কামরায় রাখা হয়েছে উইণ্টারকে, কড়া পাহারায়। তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি, ব্যাপারটা তা নয়। হাতের সবচেয়ে মাংসল জায়গায় একটা বুলেট খেয়েছে সে। একজন পাইলটের জন্যে সমস্যা হলেও, এমন নয় যে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। তার সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, তাকে পেইনকিলার দেয়া হচ্ছে না। চিৎকার করে জানালো সে, 'আমার সাথে অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে।'

হলে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলছে রানা, এই সময় এলো ওরা। ডাক্তার জানতে চাইছিলেন, টমাস কালভিনের আরো মূল্যবান কোনো অঙ্গ বিজ্ঞানের কল্যাণে দান করা যায় কিনা। জবাবে রানা বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই—টমাস বেঁচে থাকলে প্রস্তাবটায় খুশি হতো। হঠাৎ বেল বাজার শব্দের সাথে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একদল লোক।

খুনি আর গুণ্ডাদের মতোই চেহারা তাদের। বন্ধুকে হারিয়ে চরম হতাশায় ভুগছে রানা, লোকগুলোকে খুনি ধরে নিয়ে তৎপর হতে যাচ্ছিলো, তারপর লক্ষ্য করলো লোকগুলোর মধ্যে কর্নেল হার্নান্দেজ বেনিনও রয়েছেন। আরো একজন চিনতে পারলো ও। এডওয়ার্ড বার্ন, ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির স্থানীয় ডিরেক্টর। মোট তিনজন লোককে ঘিরে আছে বাকি সবাই, পরিষ্কার বোঝা যায় নিরাপত্তা

বেষ্টনী তৈরি করে রেখেছে তারা। শেষ ভদ্রলোককে চিনলো না রানা। ছোটোখাটো মানুষ, রোগা-পাতলা, সুন্দর পোশাক পরে আছেন।

কালভিনের প্রাপ্য, কিন্তু গ্রহণ করতে হলো রানাকে—ওর পিঠে চাপড় মারলেন কর্নেল বেনিন, শরীরটা ঝাঁকি খাওয়ায় হাতের ব্যথাটা বেড়ে গেল রানার। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আলিঙ্গন করলেন কর্নেল। চোখে পানি নিয়ে প্রিয় বন্ধু টমাসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন তিনি। রানার সাথে তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক ইবানো ভাপুর, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। কার্টেলের দ্বারা সংঘটিত সর্বশেষ হত্যা-কাণ্ডের বর্ণনা নিজের কানে শোনার জন্যে সশরীরে হাজির হয়েছেন।

একটা স্টাফ রুমে বসলো ওরা, অতিরিক্ত লোকদের বাদ দিয়ে। স্প্যানিশ ভাষায় সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিলো রানা, অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার ভালো ইংরেজি জানেন না। সবিনয় ভদ্রতার সাথে নিঃশব্দে শুনে গেলেন তিনি, মাঝে-মধ্যে গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন। তাঁর মাথায় ঘন কালো চুল, বাঁ গালে বিউটি স্পট অর্থাৎ কালো একটা তিল। তাঁর স্যুটটা জ্যাক মরিসের চেয়ে দামী।

রানা থামতে বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন ইবানো ভাপুর, অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'এই বর্বরোচিত হামলার পরিণতিতে আমরা একজন সাহসী বন্ধুকে হারালাম।'

এডওয়ার্ড বার্ন তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের আসলে এয়ারপোর্টের ভেতরই থাকা উচিত ছিলো, মাসুদ। ওখানে থাকলে তোমাদেরকে প্রোটেকশন দেয়া সম্ভব হতো।'

'এয়ারপোর্টের ভেতরও অস্ত্র ছিলো,' বললো রানা। 'আর আমার নাম রানা। আপনি যদি কখনো অন্য নামে ডাকেন—ঝট করে সরে

যাবেন।'

'প্লিজ,' অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার অনুরোধ করলেন। 'নিজেদের মধ্যে আমরা ঝগড়া করতে চাই না। পরস্পরের সাথে সহযোগিতা না করলে লাভবান হবে শত্রুপক্ষ।'

'গুড,' বললো রানা।

এডওয়ার্ড বার্ন কিছু বললেন না। নামটা আমেরিকান হলেও, তিনি আসলে কিউবান, নোটারি পাবলিক-এর কাছে আবেদন করে নাম বদলেছেন, স্বভাবতই সি. আই. এ.-র পরামর্শে। সি. আই. এ.-তে গোপনে নাম লেখাবার আগে মায়ামি সৈকতে পেশী দেখিয়ে খ্যাতি বা কুখ্যাতি যাই বলা হোক, যথেষ্টই কামিয়েছিলেন। রানা তাকে বিশ্বাস করে না, অনেক কারণের একটা হলো আজ পর্যন্ত যতো কিউ-বানের সাথে পরিচয় হয়েছে ওর, তাদের মধ্যে একজনও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে পারেনি। কিউবানরা সব সময় দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। তার একটা হলো, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। সি. আই. এ. সব সময় তাদেরকে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে, ওটা তারা ওদেরকে পাইয়ে দেবে।

'মিনিস্টার দুঃসময়ে এসেছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে করে সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন,' বললেন কর্নেল। 'যে ট্রাজেডিটা ঘটে গেছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোককে তা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। ফলে সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কার্টেলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হবে। এটা যে শুধু কথার কথা নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্যে সরকার ভিক্টর লজেনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে রাজি হয়েছে, সেখানেই তার বিচার করা হবে।'

'ভেরি গুড,' বললো রানা, ব্যাপারটা আসলেও তাই। 'এবার তাকে খুঁজে বের করুন।'

'করবো বৈকি,' বললেন এডওয়ার্ড বার্ন।

'অবশ্যই খুঁজে বের করবো,' রাজি হলেন কর্নেল।

'কিন্তু কখন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'লোকজনকে কিনে ফেলার চেষ্টা করবে সে। চেষ্টা করবে খুন করার। তারপর দেখা যাবে সিদ্ধান্ত পাল্টে গেছে।'

আহত হলেন কর্নেল। এডওয়ার্ড বার্ন রেগে গেলেন। তবে মন্ত্রী ভদ্রলোক, যিনি অপমান হজম করতে অভ্যস্ত, কূটনীতির ভাষায় জবাব দিলেন, 'আমরা খুন হয়ে যেতে পারি, মিঃ রানা, কিন্তু একজন ক্রিমিনালের কাছে বিক্রি হয়ে যাবো না বা তার ভয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টাবো না। ভিক্টর লজেনকে খুঁজে বের করার জন্যে সরকারের সব ক'টা ডিপার্টমেন্ট সম্ভাব্য সব কিছু করবে।'

রাজনীতি ভালো বোঝে না রানা, তবে জানে মার্কিন অনুরোধে সাড়া দিয়ে কলম্বিয়া সরকার কেন লজেনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে রাজি হয়েছে। হরতালের ডাক দিয়ে রাজনীতিতে একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে চাইছে লজেন, সরকার যেটা পছন্দ করতে পারছে না। সরকারের জন্যে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। টমাস কালভিনের মৃত্যু স্রেফ একটা অজুহাত এনে দিয়েছে। 'ধন্যবাদ, মিঃ ইবানো ভাপুর,' বললো রানা। 'তবে আমার পরামর্শ হলো, লজেনকে ধরার যে প্ল্যানই গ্রহণ করা হোক, সেটা যেন আপনি আর আপনার মিনিস্টার ছাড়া আর কেউ না জানতে পারে। তা না হলে লজেনকে ধরা সম্ভব হবে না।'

মাথা নত করে বাউ করলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। 'পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, মিঃ রানা।'

'সেক্ষেত্রে,' বললো রানা, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইন্টেলিজেন্স

রিপোর্ট আপনাকে আমি জানাতে চাই, মিঃ ভাপুর। আপনাকে, আর কর্নেল বেনিনকে।'

রানার বাম দিকে বাদামী স্যুটের ভেতর বসবাস করছে একজন চির শত্রু। এডওয়ার্ড বার্নের নাকের ফুটো, এতো চওড়া যে একেকটায় দুটো করে আঙুল ঢুকে যাবে, আরো চওড়া হলো। ওয়াশিংটনে হলে কি করতেন বলা যায় না, হয়তো রানাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়ে বসতেন। কিন্তু কলম্বিয়ান অফিসারদের সামনে রানাকে শুধু হুমকি দিলেন তিনি, 'আমি ব্যবস্থা করছি, তোমাকে যাতে রাত নামার আগেই কলম্বিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়।'

'বলুন, চেষ্টা করবেন। আরো নির্ভুল হতে চাইলে বলুন, ব্যর্থ চেষ্টা করবেন।'

আর কিছু বললেন না বার্ন। অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টারের দিকে ফিরে বাউ করলেন তিনি, সামান্য কম ঝুঁকলেন কর্নেলের উদ্দেশ্যে, তারপর রানার দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

এডওয়ার্ড বার্ন বেরিয়ে যাবার পর রানার দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন ইবানো ভাপুর। 'ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'আমার ধারণা,' বললো রানা, 'মার্কিন দূতাবাসের ইকোনমিক সেক্রেটারিদের সাথে বড় বেশি মেলামেশা করেন সিনর বার্ন। আমার জানা তথ্য হলো, সেক্রেটারিদের সাথে লজেনের অদৃশ্য একটা বন্ধন আছে। তার কাছ থেকে টাকা খেয়েছে তারা, সম্ভবত মধ্য আমেরিকায় যুদ্ধ বাধানোর চাঁদা হিসেবে। এই কারণে লজেনের ভক্ত হতে হয়েছে তাদের।'

দ্রুত, সতর্কতার সাথে কর্নেলের দিকে ফিরলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনি-

স্টার, কর্নেলও দ্রুত ও সাবধানতার সাথে জবাব দিলেন, 'আমার ধারণা, মিঃ রানার অনুমান মিথ্যে নয়।'

'আমার যদি ভুল হয়ে থাকে, ক্ষমা চাই,' বললো রানা। 'তবে, ভুল বোঝাবুঝির জন্যে কোনোভাবেই আপনাকে সে দায়ী করতে পারবে না।'

কথাটা শুনে খুশি হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। মৃদু হাসলেন তিনি। 'এবার আপনার প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন, মিঃ রানা। আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন না?'

মাথা নাড়লো রানা। 'আপনি স্বরাষ্ট্র দফতরের লোক হলে জানতে পারতেন। আমি কলম্বিয়ায় এসেছি আপনার সরকারের অনুমতি নিয়ে, বাংলাদেশী একজন নাগরিক হিসেবে, যদিও আমার সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে আমার উদ্দেশ্য ও পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। সবাই জানে, আমি একজন ক্যানাডিয়ান ট্যুরিস্ট, অনেকেই জানে আমি মার্কিন একটা ইন্টেলিজেন্স সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করছি।'

'বুঝলাম,' ইবানো ভাপুর হাসলেন। 'কলম্বিয়ায় আপনার আসার উদ্দেশ্যটা...।'

'সংক্ষেপে, বাংলাদেশে কলম্বিয়ার যে কোকেন ঢুকছে, আমরা সেটা বন্ধ করতে চাই। আরো একটা উদ্দেশ্য আছে আমার, তবে সেটার কথা জানতে পারবেন উদ্দেশ্যটা পূরণ হলে। শুধু এটুকু বলি, আমার দ্বারা আপনার দেশের কোনো ক্ষতি হবে না।'

'শুনে আশ্বস্ত বোধ করছি, মিঃ রানা,' বলে কর্নেলের দিকে দ্রুত তাকালেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার, যেন জানতে চান তাঁর আশ্বস্ত বোধ করাটা উচিত হয়েছে কিনা।

কর্নেল বেনিন তাড়াতাড়ি বললেন, উনি খুব কাজের লোক, স্যার।

ওনার কৃতিত্ব সম্পর্কে এখন যদি বলতে শুরু করি, উনি লজ্জা পাবেন। আপনাকে পরে এক সময় জানাবো।'

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে রানা বললো, 'ভিক্টর লজেন কোথায় আছে তা বোধহয় আমি জানি।'

'ইয়েস?' আগ্রহের সাথে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন ইবানো ভাপুর।

'আমাকে একটা হেলিকপ্টার আর কিছু সশস্ত্র লোক দেয়া হলে তাকে আমি ধরতে পারি। কাল এই সময় আমার সামনে তাকে দেখতে পাবেন আপনারা। আমার শুধু দরকার, তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে নিরাপদ একটা সূত্র।'

চোখ মিটমিট করলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। কর্নেলের দিকে তাকালেন না। 'আমি কি ধরে নেবো, আপনি একজন সন্ধানদাতার সাহায্য চাইছেন?'

'আপনি ঠিক ধরেছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার,' বললো রানা।

'সেই সাথে আপনি আবেদন করছেন, তথ্য পাবার পর অপারেশন টায় আপনি যাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন?'

ঠিক তাই চাইছে রানা। অপারেশনে থাকতে হবে ওকে, কারণ হেনেরিক মুলারের কাছে পৌঁছুনোর আর কোনো উপায় নেই। 'জ্বী,' বললো ও। 'সিকিউরিটি হতে হবে নিশ্ছিদ্র। কারো জানা চলবে না কোথায় আমরা যাচ্ছি। লজেনকে আটক করা সম্ভব হলে, পুলিশ বা আধা সামরিক বাহিনীর লোকজন তাকে গ্রেফতার করতে পারে, আপনারা যেমন বলেন।'

অস্বস্তিবোধ করছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিনিস্টার। বিদেশী একজন স্পাই-কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি কলম্বিয়ায় কাজ করার অনুমতি দিয়ে থাকে,

তার বাধা দেয়ার কোনো অধিকার নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'কিন্তু আপনি যদি ভিক্টর লজেনকে ডেলিভারি দিতে ব্যর্থ হন ?'

'সেক্ষেত্রে সময় ছাড়া আর কিছুই আপনারা হারাচ্ছেন না,' বললো রানা।

মাঝখান থেকে কর্নেল বেনিন বললেন, 'কিন্তু আমরা হয়তো আপনাকে হারাবো। আপনার ব্যর্থতা মানে আপনার মৃত্যু, এটুকু অন্তত পরিষ্কার, তাই না, মিঃ রানা ? লজেনকে আপনি চেনেন।'

'বন্ধুর জন্যে মানুষ আত্মত্যাগ করে না ?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা। এ-ধরনের ভাবাবেগের মূল্য দেয় কলম্বিয়ানরা, কথাটা বলার সেটাও একটা কারণ।

হাসপাতাল থেকে সামান্য দূরে ডি. এ. এস. হেডকোয়ার্টার। ওখানে পৌঁছে মেরিল্যাণ্ড, ফোর্ট মীডি-তে ফোন করলো রানা। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সাথে কথা হয়ে আছে, বিপদের সময় তারা ওর কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করবে না, তবে অন্য সময় যোগাযোগ করা যাবে, এমনকি টেকনিক্যাল সাপোর্ট চাইলে তা-ও বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া, ডি. ই. এ.-র এডওয়ার্ড বার্ন ফোনের ডায়াল ঘোরাবার আগেই কিছু একটা করা দরকার রানার।

মেরিল্যাণ্ড সাড়া দিলো, তবে সতর্কতার সাথে। এন. এস. এ. হেডকোয়ার্টার থেকে রানাকে জানানো হলো, আলোচ্য এলাকাটা কাভার করার জন্যে প্রচলিত ভোরটেক্স ফটোগ্রাফিক লিঙ্ক-কে পজিশনে আনা যাবে না। একমাত্র বিকল্প হলো, নতুন ও পরীক্ষাধীন রাডার-ইমেজ স্যাটেলাইট। ওটা থেকে যে ফটো আসছে তা সন্তোষ-

জনক নয়, তবে কমপিউটার গ্রাফিক্স, যা ফটোরই নামান্তর, রাতের অন্ধকারে বা খারাপ আবহাওয়ায়ও চমৎকার আসে।

মেসেজ পাঠিয়ে ফিরতি ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, এই সুযোগে অপারেশনের আয়োজন সম্পর্কে কর্নেলের সাথে কথা বলে নিলো। কর্নেল আর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মিনিস্টারকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে এসেছে লেফটেন্যাণ্ট নাসাউ, কাজেই পরিবহন কোনো সমস্যা হবে না। হেলিকপ্টার এই মুহূর্তে প্রস্তুত হয়েই আছে, তৈরি হয়ে আছে ডি. এ. এস.-এর একটা স্কোয়াডও। সবশেষে কর্নেল বললেন, 'অবশ্য আপনার টার্গেট যদি ঠিক থাকে।'

রানা ধরে নিলো আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে মেরিল্যাণ্ডের সাথে ওর কথাবার্তা সবই শুনেছেন কর্নেল, তবে কোড করা বার্তাটুকু বোঝেননি। 'টার্গেট সম্পর্কে নিশ্চিত হবার ব্যবস্থা করেছি, মিঃ বেনিন,' বললো ও। 'লোকেশন জানার জন্যে স্যাটেলাইটের সাহায্য চেয়েছি আমি।'

ধূর্ত হাসি দেখা গেল কর্নেলের ঠোঁটে। 'স্বর্গ থেকে একটা ক্যামেরা কি-ই বা আপনাকে জানাতে পারবে?'

মুচকি হাসি হেসে রানা বললো, 'কি দিয়ে তারা ব্রেকফাস্ট করছে।'

কথাটা কর্নেল বিশ্বাস করলেন না, কারণ নিতান্ত হালকা সুরে তা বলা হলো। তবে অনুকূল পরিবেশে, একটা আধুনিক স্যাটেলাইট প্রায় আক্ষরিক অর্থেই এ-ধরনের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। এন. এস. এ.-র ক্ষমতা সম্পর্কে না জানার ফলে কলম্বিয়ার একজন কর্নেল যদি নার্ভাস হাসি দেন, ক্ষতি নেই। অবিশ্বাসীরাই মত পাল্টাবার পর সাচ্চা বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

সেটা ঘটতেও বেশি সময় লাগলো না। দু'ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে নিজের ফোনে খবরটা পেলেন কর্নেল। আবিষ্কারের পদ্ধতিটা

যেন আকস্মিক বিদ্যুৎচমকের মতো। সব কিছু উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

রাডার ইমেজ থেকে মুয়েলার এস্টেট সম্পর্কে কৌতুহলোদ্দীপক কয়েকটা ব্যাপার জানা গেছে। জানা গেছে, বিল্ডিংগুলো, গোটা হাসিয়েনদাই, খালি পড়ে আছে। হাসিয়েনদা সহ চারপাশটা মনে হয়েছে, পরিত্যক্ত। তবে, পশ্চিম প্রান্তে কিছু নড়াচড়া ধরা পড়েছে।

ওখানে, মাটি থেকে বেশ খানিকটা ওপরে, ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ আর পাহাড়ী চাতালের মাঝখানে, কয়েকটা বিল্ডিং আছে। সম্ভবত লোক-জনও আছে। প্রধান ভবনের কাছাকাছি দেখা গেছে একটা হেলি-কপ্টার। ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপটাও খালি নয়, হালকা একটা প্লেন রয়েছে। গ্রাফিক্সে দুটো মনুষ্যমূর্তিও দেখা গেল, বাড়ির বাইরে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তূতকিমাকার আকৃতি দেখে অনুমান করা হলো, ভবনগুলোয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে জেনারেটরও আছে।

এইটুকুই জানার দরকার ছিলো রানার। ফোনটা যখন এলো, তার আগেই রেডিওরুমে কর্নেলকে ডেকে নিয়েছে রানা। ওর সাথে একটা ডিকোডার যন্ত্র রয়েছে। মেসেজটা দু'জনে একই সাথে বুঝলো।

'টেকনোলজিতে কি জাদু!' সবিস্ময়ে বললেন কর্নেল। 'এ ধরনের সুবিধে পাওয়ার জন্যে একটা হাত হারাতেও আপত্তি নেই আমার।'

'আপনি বললে ব্যাপারটা নিয়ে আমি এন. এস. এ.-র সাথে কথা বলতে পারি,' বললো রানা। 'আপনার অনুরোধ তারা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে বলেই আমার ধারণা, বিশেষ করে যদি কথা দেন সুবিধেটা পেলে তা কার্টেলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।'

'আপনি দেখছি সিরিয়াস,' গম্ভীরসুরে বললেন কর্নেল। 'লক্ষ্য করেছি অবিশ্বাস্য কিছু বলার সময় আপনাকে ভারি সিরিয়াস দেখায়।'

'আমি ওদেরকে বললে কাজ হবে, ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়,'

বললো রানা। 'ওরা যদি সুবিধেটা আপনাকে দেয়, আপনার প্রতি সন্তুষ্ট বলেই দেবে। মাঝখান থেকে আমার শর্ত হলো, নেগোসিয়েশন-এর ফি বাবদ, বর্তমান অপারেশনের কম্যাণ্ডিং অফিসারের পদটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

ব্যাপারটা পছন্দ হলো না কর্নেলের, তবে তিনি জানেন যে দুনিয়াটা এমন এক জায়গা যেখানে বিনা শর্তে কিছুই পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দু'আঙুলে ধরে গোঁফ মোচড়াতে শুরু করলেন তিনি। 'তারমানে কি, মিঃ রানা, আপনি বলতে চাইছেন, আপনার সাথে আমাকে বা অন্য কোনো সিনিয়র কলম্বিয়ান অফিসারকে রাখতে চান না?'

'ঠিক ধরেছেন।'

আরো গম্ভীর হলেন কর্নেল বেনিন। 'কারণটা কি জানতে পারি?'

'কারণটা হলো, আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে। উত্তরটা শুধু লজেন জানে।'

'উত্তরটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'হ্যাঁ, আমার কাছে,' বললো রানা।

'আপনার কাছে, আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির কাছে।'

'তারাও আগ্রহী।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কর্নেল বললেন, 'উত্তরটা আর কারো জানা চলে না, বলতে চাইছেন।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা।

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কর্নেল। তারপর বললেন, ঠিক আছে, মিঃ রানা।'

'আমাকে এখুনি রওনা হতে হবে, কর্নেল,' বললো রানা।

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন কর্নেল। 'এক্সট্রাডিশন অর্ডার সম্পর্কে যে-কোনো মুহূর্তে খবর পেয়ে যাবে লজেন। হয়তো এরইমধ্যে জেনে ফেলেছে সে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'কলম্বিয়ার হালচাল তো আপনি জানে-নই।'

# ছয়

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা হবার আগে লিলিয়ানের কাছ থেকে মুয়েলার এস্টেটের বিশদ বর্ণনা পেয়েছিল রানা, তা না পেলে ওখানে ঢোকার কথা চিন্তাও করতো না ও। লিলির বর্ণনা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে. হেনেরিক মুলারের এলাকায় একবারই মাত্র ঢোকার চেষ্টা করা যেতে পারে; কারণ দ্বিতীয়বার সে-চেষ্টা করলে মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।

হাঁটাপথে এস্টেটে পৌঁছানো সহজ কাজ নয়। মেডিলিন আর কালি শহরের মাঝখানে ইংরেজি ভি অক্ষরের আকৃতি নিয়ে একটা পাহাড়ী উপত্যকা আছে, জায়গাটা ওখানে। হাইল্যাণ্ড থেকে গড়িয়ে নামছে একটা ঝর্নাধারা, পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে কাউকা নদীর উত্তর-দক্ষিণ প্রবাহে মিলিত হবার সময় চওড়ায় বেড়ে গেছে। ওখানে একটা গ্রাম

আছে, নাম লস আগুয়াস দে পিউরিফিকেশন, বাস করে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা।

এলাকার আদিবাসীদের চাষবাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন রলফ মুয়েলার, রুগ্ন আত্মীয়স্বজনদের দিয়েছেন ওষুধ আর চিকিৎসা-সুবিধে, রক্ষা করতে সাহায্য করেছেন তাদের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য। তাঁর প্রশ্রয় পেয়ে ইণ্ডিয়ানরা কোকা পাতাও ব্যবহার করতে পারছে অবাধে। এরমানে হলো, কোকা পাতার একটা বাজার তৈরি করেছেন তিনি, নিজেকে ওদের কাছে প্রিয় করে তুলেছেন, সেই সাথে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি টিকিয়ে রেখেছেন। বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে নাক আর কানের সহযোগিতা ছাড়া আর কিছু চান না তিনি।

কোনো আগন্তুক এলাকায় ঢুকলে, সাথে সাথে খবরটা প্রচার হয়ে যায়। এলাকার কর্তৃপক্ষ বিক্রি হয়ে গেছে, রলফ মুয়েলারকে তারা স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করে। ইণ্ডিয়ানরা তাঁর ভক্ত। লা ভায়োলেনশিয়া যখন তুঙ্গে, তখনো পাশের শহর আর মুয়েলার এস্টেটে সবাই শান্তিতে ঘুমাতে পারে। উদারনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলন অনুপস্থিত, বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের হাঙ্গামা বাধাবার নেই কোনো সুযোগ। জাতীয় নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দেয় নির্বিঘ্নে, যাকে দিতে বলা হয় তাকেই।

এ-সব কথা ভেবেই সিকিউরিটির ব্যাপারে কঠিন হতে হয়েছে রানাকে। কলম্বিয়া সরকারের কোনো প্রতিনিধিই আপোসের ঊর্ধ্বে নয়। কর্পূরের মতো অদৃশ্য হতে শুধু সামান্য একটা বেফাঁস শব্দ দরকার লজেনের।

শেষ মুহূর্তে হেলিকপ্টারের টেইল রোটরে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় রওনা হতে দেরি হলো ওদের। আকাশে উঠে উপত্যকা ধরে

দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা, ঘড়িতে বাজে এগারোটা। যেখানে সম্ভব, ফসলের ডগা ছুঁয়ে উড়লো চপার, সম্পূর্ণ মৌনব্রত পালন করলো রেডিও। ওদের উপস্থিতি প্রকাশ করার জন্যে থাকলো শুধু জেট-টারবাইন এঞ্জিনের গর্জন।

শব্দটা মারাত্মক, তবে মুয়েলার এস্টেট থেকে দূরে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। খুব কাছাকাছি যাবার প্ল্যানও রানা করেনি। এয়ার-স্ট্রিপের কাছে শুধু যে মর্টার এমপ্লেইসমেণ্ট আছে তাই নয়, উইণ্টারের কাছ থেকে জানা গেছে মাঝে-মধ্যে কমাণ্ড পোস্টে হাতে বহনযোগ্য রকেট লঞ্চারও মোতায়েন রাখে লজেন, নির্ভর করে তার উদ্বেগ আর ভয়ের মাত্রার ওপর। শোনা যায়, রহস্যময় কোনো উৎস থেকে সে নাকি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি স্টিংগার গ্রাউণ্ড-টু-এয়ার মিসাইল'ও হাত করেছে।

সে-কারণেই এই সাবধানতা, উপত্যকার কিনারা ধরে বিশাল একটা বৃত্ত তৈরি করলো রানার হেলিকপ্টার। আট হাজার ফুট ওপরে উঠলো চপার, পাহাড়ের প্রথম সারিটা টপকালো, উচ্চতা কমিয়ে নেমে এলো সাড়ে সাত হাজার ফুটে, পৌঁছুলো শুকনো একটা টেবিল-ল্যাণ্ডের ওপরে—এটার পিছনেই মুয়েলার এস্টেট।

উঁচু সমতল ভূমিতে কোনো লোকবসতি নেই, যদিও জায়গাটা এতো বেশি উঁচু নয় যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে অনুপযোগী। আরো পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে কিছু মাটি থাকায়, রোদ আর বৃষ্টির সহায়তা পেয়ে সামান্য ঘাস আর অন্যান্য চারা গজিয়েছে। টেবিল-ল্যাণ্ডের এদিকটায় কিছু কুঁড়েঘর দেখা গেল, ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে, পরবর্তী পাহাড়ী ঢালের দিকে। তবে পুব দিকটা ঠিক যেন চাঁদের পিঠ—পাথুরে জমি আর বেঢপ বিকৃত ক্যাকটাস ছাড়া দেখার কিছুই

নেই।

কাঁটাঝোপ আর পাথরের মাঝখানে নামলো ওরা। পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে পায়ে-চলা পথ, ট্রেইল থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে হেলিকপ্টার নামালো লেফটেন্যান্ট নাসাউ, চারদিকে ধুলোর পাহাড় উঠলো। লোকজন নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো সে। লোকটা তার কাজ বোঝে। প্রায় চোখের নিমেষে ঢেকে ফেলা হলো চপারটাকে। ট্রেইল থেকে চপারের কাছে যদি কেউ আসতে চায়, তাকে যুদ্ধ করে এগোতে হবে, ছড়িয়ে পড়ে এমনভাবে পজিশন নিলো লোকগুলো।

রানার নির্দেশ পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে লেফটেন্যান্ট। উঁচু জমি ছেড়ে কোথাও যাবে না সে। পিছনে থাকবে হেলিকপ্টার আর দু'জন পাহারাদার, রানার বেতার সংকেত পাবার অপেক্ষায়।

'কিন্তু যদি কোনো বেতার সংকেত না আসে?' জিজ্ঞেস করলো লেফটেন্যান্ট, বাস্তববাদী লোক সে।

'সেক্ষেত্রে তোমরা বেস-এর সাথে যোগাযোগ করবে, বলবে সাহায্য দরকার,' জানালো রানা। 'কোনো অবস্থাতেই সরাসরি এস্টেটে ঢুকবে না।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না,' লেফটেন্যান্ট ইংরেজিতে বললো।

'আমার সংকেত না পাবার অর্থ হবে, কিছু একটা বিপদ হয়েছে, লেফটেন্যান্ট। এরপর তোমরা যদি এস্টেটে ঢুকতে চেষ্টা করো, দামী চপারটা হারাতে হতে পারে, মারা যেতে পারে আরোহীরা। আর যদি এখানে থাকো, চোখ রাখো উপত্যকার ওপর, জানতে পারবে আকাশ পথে কেউ পালাবার চেষ্টা করলো কিনা।'

মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো লেফটেন্যান্টের শরীর। 'পিছু ধাওয়ার অনুমতি আছে কি?'

'অবশ্যই।'

মনের মতো উত্তর পেয়ে একগাল হাসলো লেফটেন্যান্ট নাসাউ। 'ইয়েস, স্যার।'

সাতজন লোককে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো রানা। প্রথম কয়েক শো গজ ট্রেইল ধরে এগোলো ওরা, রানার ধারণা এদিকে কারো সামনে পড়ার ভয় নেই। যদি পড়ে, আটক করে হেলিকপ্টারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে বেঁধে রাখার জন্যে। আর যদি বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়, সরাসরি খুন করার জন্যে ট্রিগার টেপার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে রানা।

ঢাল বেয়ে দ্রুত নামছে ওরা। শক্ত ঘাসের চাপড়া লাফ দিয়ে পার হলো, কাঁটাঝোপ এড়াবার জন্যে এঁকেবেঁকে ছুটলো। আরেক ঢালে চলে এলো ওরা, এদিকে ইউক্যালিপটাসের কচি চারা দেখা গেল, বাতাসে পুদিনার গন্ধ। মাত্র একবারই থামলো ওরা, হাত তুলে একটা কোকা ঝোপ দেখালো সার্জেন্ট বুলি।

এতো যার কুখ্যাতি আর প্রভাব, দেখতে সেটা ভীরু আর শান্ত প্রকৃতির। অনেকটা লম্বা হতে পারলেও, সযত্নে লালিত কোকা ঝোপকে সাধারণত ছ'ফুটের বেশি উঁচু হতে দেয়া হয় না, পাতা কাটার সুবিধের কথা ভেবে। ফলগুলো উজ্জ্বল লাল। পাতাগুলো, সমস্ত ঝামেলার উৎস, ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, লম্বায় এক কি দেড় ইঞ্চির বেশি নয়, ইণ্ডিয়ান-দের হাতের মতোই সবুজ। কয়েকটা পাতা মুখে দিয়ে চিবাতে চিবাতে কাজে যায় তারা, তাদের এই পবিত্র ও দরকারী ঝোপ যে আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে মারাত্মক বিষে পরিণত হয়ে গোটা দুনিয়াকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে, সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়।

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ইণ্ডিয়ানরা তাদের খেতে আসে না; তবু

পরবর্তী পনেরো মিনিট চোখ-কান খোলা রেখে সাবধানে এগোলো ওরা। আরো পাঁচশো ফুট নেমে ট্রেইলটাকে চোখের আড়ালে হারিয়ে ফেললো রানা, এখানে আবার হঠাৎ করে বদলে গেল গাছপালার ধরন, শুরু হলো একদিকে বাঁশ ঝাড় অপর দিকে ভুট্টা খেত।

স্বচ্ছ, দ্রুতগতি ঝর্নাটা দেখেই বুঝলো রানা, টার্গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এখানে দলটাকে ভাগ করলো ও। ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ দখল করার জন্যে পাঠালো তিন জনকে, দক্ষিণ-পুব দিকে। প্লেনটার পাশে নিশ্চয়ই গার্ড আছে, সম্ভবত একজনের বেশি নয়। ভিক্টর লজেনকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হবে না।

বাকি পাঁচজনকে নিয়ে ঝর্না পার হলো রানা, খেতের পাশ দিয়ে সরু পথ ধরে এগোলো। একটা ওক গাছের নিচে এসে থামলো ওরা। গাছে ওঠা কোনো সমস্যা হলো না, চোখে পেনট্যাক্স স্কোপ লাগাতেই সিনেমার মতো উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠলো।

দৃশ্যটা অস্ট্রিয়ান বলা চলে। অবশ্যই বাভারিয়ান নয়, কারণ নিখুঁতভাবে অতীতকে পুনর্গঠন করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, মাঝে-মধ্যে ছড়িয়ে আছে গাছপালা, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ঝর্না কলকল ছলছল করে বয়ে চলেছে বিল্ডিংটার পাশ ঘেঁষে, রাজরাজড়ার হান্টিং লজের মতো দেখতে সেটা।

অস্ট্রিয়ানরা মজবুত ও নিরেট জিনিস পছন্দ করে, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একবার চোখ বোলালেই বাড়িটাকে পাথুরে বলে চেনা যায়। গেটগুলো খিলান আকৃতির, আকারে বিশাল, যেন নরকের প্রবেশদ্বার। তিনতলার জানালাগুলো লম্বাটে, ভেতরে নির্জনতা আর অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। বিল্ডিংটার সীমানার বাইরে খোলা জায়গাটা লক্ষ্য করলো রানা।

লিলিয়ানের কথা অনুসারে, বাড়িটাকে লজ বলতো ববি মুয়েলার। একবারই মাত্র এখানে আসার সুযোগ হয়েছে তার, অসুস্থ বাবাকে দেখার জন্যে সস্ত্রীক এসেছিল ববি।

দিনটার কথা পরিষ্কার মনে আছে লিলিয়ানের। থক থক করে সারাক্ষণ কাশছিলেন রলফ মুয়েলার। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল লিলির, কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছিলো না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেও, না দেখার ভান করেন মুয়েলার।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, ববি বিয়ে করায় খুশি হয়েছিলেন মুয়েলার। তাঁর রাগ করার কারণ ছিলো, ববি তাঁকে না জানিয়েই বিয়েটা করে ফেলে। তাঁর খুশি হবার কারণটা সম্ভবত এই ছিলো যে বংশ রক্ষা হবে। এক সময়, কাশতে কাশতে, নিজেই এগিয়ে আসেন মুয়েলার, লিলির একটা হাত ধরেন, দু'বারের চেষ্টায়। কেন বলতে পারবে না লিলি, প্রথমবার ভয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল সে। পুত্রবধূকে ঝর্নার কাছে নিয়ে আসেন তিনি, ইণ্ডিয়ান জেলেদের মাছ ধরা দেখেন। জেলেরা তাঁকে উপহার দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, তারা যেন তাঁর সাথে নিয়মিত দেখা করে। যে-কোনো সমস্যা শোনার জন্যে সব সময় তৈরি থাকবেন তিনি।

সেই শেষ, এরপর আর কখনো লজে আসেনি লিলি। পরে অবশ্য আরো দু'বার বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখেছে সে, একবার নিচের হাসিয়েনদায়, দ্বিতীয়বার নিকারাগুয়াতে। নিজের পেশায় দক্ষ বলে, দেখার মতো চোখ আছে বলেও, লজের ভেতর ও বাইরে সিকিউরিটির আয়োজন সম্পর্কে ভালোই ধারণা পেয়েছিল সে।

একে একে সব মনে পড়ে গেল রানার। দক্ষিণের মাঠটায় গিজ গিজ করছে মাইন, যেগুলো মেইন সুইচ বা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে

অ্যাকটিভেট করা যায়। প্রধান ভবন থেকে পুল পর্যন্ত রয়েছে ইনট্রুশন-ডিটেকশন পেরিমিটার। লজের প্রতিটি দরজা জানালার ওপর নজর রাখছে থারমাল ও মোশন সেনসর।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটাই জানা নেই রানার, ভিক্টর লজেন এখানে আছে কিনা। তবে একজন লোককে দেখতে পেলো ও। গোলাপি বেদিং স্যুট পরে পুলের পাশে একটা লন চেয়ারে লম্বা হয়ে আছে লোকটা। কয়েক মিনিট এক চুল নড়লো না সে, তবু তার দিকে স্কোপটা তাক করে অপেক্ষায় থাকলো রানা। আরো কিছুক্ষণ পর, হঠাৎ প্রায় ঝট করে উঠে দাঁড়ালো সে, চেয়ার থেকে তোয়ালেটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো লজের দিকে। চুল আর নাকের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করে রানা উপলব্ধি করলো, লোকটা ভিক্টর লজেন।

কেয়ারি করা ফুল বাগানের ভেতর দিয়ে এগোলো লোকটা। হঠাৎ একটা ম্যাগনোলিয়া ঝোপের সামনে দাঁড়ালো সে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি আর মুখের ভাব দেখে রানার মনে হলো, সে যেন ঝোপটার সাথে কথা বলছে। অনুমান করা কঠিন কিছু নয়, ঝোপের ভেতর সম্ভবত মাইক্রোফোন আছে। কিন্তু রানার ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে দু'ফাঁক হয়ে গেল ঝোপটা, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মানুষের একটা কাঠামো। তার হাতে একটা অস্ত্রও রয়েছে, অটোমেটিক রাইফেল। গভীর মনোযোগের সাথে কমাণ্ডারের নির্দেশ শুনলো সে, মাথা ঝাঁকালো, অটল দাঁড়িয়ে থেকে দেখলো ঘুরে দাঁড়িয়ে লজের দিকে চলে গেল তার কমাণ্ডার।

হাসিয়েনদায় ক'জন আছে, কোন্ শ্রেণীতে তারা পড়ে, আন্দাজ করার চেষ্টা করলো রানা। বাগানের মালিও দেখা যাচ্ছে সশস্ত্র। আরো আছে নিরামিষ রান্নায় পারদর্শী রাঁধুনি (হিটলারেরও ছিলো)।

আপাতো খুনিদের লিডার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। লোকটা নাকি সব রকম অস্ত্রেই দক্ষ, তার হাত দুটোও নাকি হাতিয়ার বিশেষ।

যান্ত্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথাও বিবেচনা করলো রানা। ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রপাতির ওপর অতিরিক্ত ভরসা রাখার একটা প্রবণতা আছে মানুষের। জেনারেটর আর ব্যাক-আপ টিম কোথায় আছে জানা থাকায় ওগুলোর ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না। জেনারেটর অচল করা গেলে স্ট্যাটিক ডিফেন্স আর কোনো কাজে আসবে না।

সমস্যা হলো অ্যালার্ম সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে জেনারেটরের কাছে পৌছুনো। বড় জেনারেটরটা পুল পাম্প হাউজের সাথেই আছে, একটা সাপ্লাই শেডে। লিলির ধারণা, বড়টার সাথে আরো ছোটো কয়েকটা জেনারেটরের সংযোগ আছে, সেগুলো লজের নিচে কোথাও, সম্ভবত কোনো সেলার-এ, থাকার কথা। তারমানে, সংযোগটা কেটে দেয়া সম্ভব।

স্কোপে চোখ রেখে চারদিকটা আরেকবার ভালো করে দেখে নিলো রানা। তারপর নিচে নেমে অ্যাসানইমেণ্টটা বুঝিয়ে দিলো সবাইকে।

ডান দিকে, হাতে তৈরি এমব্যাঙ্কমেণ্টের ওপর, হেলিপ্যাড। গাছ-পালার আড়ালে প্লেনটা দেখা না গেলেও, রানা জানে ওটাকে নাগা-লের কাছাকাছি কোথাও রাখবে লজেন। এলাকাটা শত্রুমুক্ত করার জন্যে সার্জেণ্ট বুলিকে পাঠালো রানা, সাথে মাত্র একজনকে নিলো সে। প্রধান ভবনের তিনশো গজের বাইরে থাকতে হবে ওদেরকে, নির্দেশ দিলো রানা। যদি গুরুতর বাধার সামনে পড়ে, গুলি করবে খুন করার জন্যে। হেলিকপ্টারকে অবশ্যই নষ্ট করে দিয়ে আসতে হবে। কোনো বাধা না পেলে, কাজ সারতে হবে চুপিসারে। কোনো অবস্থা-

তেই বাড়ির সীমানায় পা রাখা চলবে না।

হেলিকপ্টার আর লজের মাঝখানে, ঘন ঝোপের আড়ালে দু'জন লোককে রাখালো রানা। যুদ্ধ শুরু না হলে নিজেদের জায়গা ছেড়ে নড়বে না তারা। শত্রুরা আক্রমণ করলে আড়াল থেকে গুলি করবে তারা। তাছাড়া আর কি করতে হবে, তাদের নিজেদের ওপর নির্ভর করবে।

লোকজনকে পজিশনে বসিয়ে দিয়ে রওনা হলো রানা। প্রথম দুশো মিটার কোনো সমস্যা হলো না। ঝোপ আর লম্বা ঘাসের নিচে মাটি খুব নরম। এরপর সামনে মাইনফিল্ড পড়লো। শুনেছে, দিনের বেলা নাকি কখনোই ওগুলো অ্যাকটিভেট করা থাকে না। তথ্য ভুল হলে, আরেকটু পরই মারা যাবে রানা। তথ্য সঠিক হলে, অনুপ্রবেশ করার এটাই যে একমাত্র পথ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখেশুনে পা ফেলার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে মাঠটা পেরোতে সময় লাগবে কয়েক ঘণ্টা। নিজের নিরাপত্তার জন্যে সময় দিতে আপত্তি নেই ওর, কিন্তু বেশিক্ষণ খোলা জায়গায় থাকাটা ঝুঁকির ব্যাপার।

রানার একবার মনে হলো, বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার পরীক্ষাটা হয়ে যাচ্ছে। মাইনফিল্ড সম্পর্কে লিলি যদি নিজের অজান্তে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, আর রানা এখন যদি মারা যায়, তাহলে? প্রমাণ হবে, লিলিকে রানা বিশ্বাস করতো। কিন্তু লিলি যদি ইচ্ছে করে ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, যদি বেঈমানী করে থাকে, তাহলে? প্রমাণ হবে, রানাকে সে ভালোবাসে না।

যতোটা সম্ভব আড়াল নিয়ে এগোলো রানা। ছোট্ট একটা নালার উঁচু কিনারা ধরে বেশ খানিকটা সামনে বাড়ার সুযোগ হলো। ঘাস যথেষ্ট লম্বা হলেও, কোথাও কোথাও ঘাসের কোনো অস্তিত্বই নেই।

একটা আম গাছের আড়াল পেয়ে আরো দশ গজ এগোলো ও। আড়াল থেকে বেরোতেই চৌকো একটা ঘর দেখতে পেলো। হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো রানা, জানে ওই শেডেই বড় জেনারেটরটা আছে।

মাটিতে মাঝে মধ্যে শুধু ঘাসের চাপড়া লক্ষ্য করলো রানা। ডগাগুলো শুকিয়ে আছে দেখেই ধরা পড়েছে চোখে। নির্ঘাৎ মাইন চাপা দেয়া হয়েছে ওগুলো দিয়ে। বেশ কয়েকটার ওপর দিয়ে হয়তো হেঁটে এসেছে ও। বিপদের আশংকা দেখা না দিলে ওগুলোকে পুরোপুরি জ্যান্ত বা বিস্ফোরণের জন্যে প্রস্তুত করা হয় না।

দশ মিনিটের মধ্যে মাইন ফিল্ডকে পিছনে ফেলে এলো রানা। পুলের পিছনে খোলা জায়গাটায় থাকার সময় সেনসরগুলো যদি ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়ে থাকে, নিজেকে নিরাপদ ভাবা যেতে পারে। ক্যামেরা বা মনিটরগুলোর ব্যাপারে করার কিছু নেই ওর। করার কিছু নেই যদি হেলিপ্যাডে বিপদ ঘটে থাকে।

সাপ্লাই শেডের পিছনে একটাই জানালা, সেটা বন্ধ, তবে ইলেক-ট্রনিক সেনসর দিয়ে সুরক্ষিত নয়। ব্যাগ থেকে কাটিং টুল বের করে ফ্রেম থেকে লোহার পাত আর রড কেটে নিলো রানা, ভেতরে ঢুকতে এক মিনিটও লাগলো না। দু'মিনিটের মাথায় জেনারেটরের ফুয়েল লাইন প্রাইমাকর্ড দিয়ে বাঁধা শেষ করলো। ডিটোনেটর দিয়ে অ্যাকটি-ভেট করলে, প্রাইমাকর্ড অর্থাৎ সি-ফোর ফিউজ ফুয়েল লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

জানালা গলে মাটিতে না নেমে, ছাদে উঠে এলো রানা। ছাদের কিনারা ধরে পুলের কাছাকাছি চলে এসেছে, গুলির প্রথম শব্দটা কানে ঢুকলো।

জেনারেটরটা বিস্ফোরিত করা গেল না। ছাদ থেকে নামতে যাবে

রানা, পুলের পাশের কেবিন থেকে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো লোমশ এক লোক। শর্টস পরে আছে সে। চারদিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকালো, স্যাৎ করে সরে গিয়ে আড়াল নিলো ডাইভিং বোর্ডের পিছনে। হাতে একটা কেজি-নাইন রয়েছে, লজেন সংগঠনের বাকি সবার হাতে যেমন থাকে। পুলের কিনারা ধরে যাবার সময় নিজের অজান্তে অস্ত্রটা রানার দিকে তাক করলো সে।

ওপর দিকে মুখ তোলার কথা নয়, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ মুখ তুলে সরাসরি রানার দিকে তাকালো লোকটা। তাকালো, কিন্তু গুলি করার সুযোগ পেলো না। কেজি-নাইনের ট্রিগার টানতে যাবে, রানার গুলি খেয়ে ছিটকে পড়লো পুলের পানিতে। ছলাৎ করে শব্দ হবার আগে আরো একটা গুলি করলো রানা।

ব্যাপারটা একতরফা রইলো না, কারণ প্রায় সাথে সাথে রানাকে লক্ষ্য করেও গুলি হলো। ব্যাগটা নিচে ফেলে দিলো ও, টিনের ছাদে গুলির শব্দ কানে নিয়ে নিজেও লাফ দিলো।

কোথেকে আসছে গুলি, রানার কোনো ধারণা নেই। একটা গাছের আড়ালে থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিলো ও, ছুটলো কেবিন আর গ্যারেজের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটা ধরে।

কোনো বুলেট পিছু নেয়নি, যদিও কেবিন আর শেড লক্ষ্য করে এখনো গুলি করা হচ্ছে। এক মুহূর্ত থেমে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো রানা। ওর মনে হলো, লজের দু'জায়গা থেকে গুলি করা হচ্ছে। দু'তলার মেইন রুম আর তিনতলার সিঁড়ির সাথে সরু জানালা থেকে। দু'জায়গা থেকেই গুলি করে রানাকে ফেলে দেয়া সম্ভব, কিন্তু এরই-মধ্যে পাইন বন থেকে তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া শুরু হয়েছে, পাল্টা জবাব দিতে তারা ব্যস্ত।

লজের দিকে তাকিয়ে একটা হিসাব পাবার চেষ্টা করলো রানা। সতর্ক পাহারা না থাকলে তিনটে জায়গা দিয়ে লজের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করা যায়। বড় চিমনি আর বিল্ডিংটার কোণ, দুটোর মাঝখানে সরু একটা ফাঁক রয়েছে, সেটা লক্ষ্য করে ছুটলো ও। প্রথম দশ ফুট ওর দিকে কোনো বুলেট ছুটে এলো না, তারপর দুই বা তিনটে অটো-মেটিক রাইফেল গর্জে উঠলো, গুঁড়িয়ে দিলো গ্যারেজের দরজাটা।

ফিল্ডস্টোন চিমনিটা বিল্ডিঙের দেয়াল থেকে ছ'ইঞ্চির মতো বেরিয়ে রয়েছে। চিমনির কোণ থেকে উজির নলটা বের করে দিলো রানা, একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ শুরু করলো, কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে বুঝলো জানালার দিকে স্থির ছিলো লক্ষ্য। জানালার পিছনে দাঁড়ানো লোকটা আর্তনাদ করে উঠলো। এক মুহূর্তের জন্যে আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো রানা, কংকাশন গ্রেনেড অ্যাকটিভেট করলো, ছুঁড়ে দিলো বিধ্বস্ত জানালা লক্ষ্য করে।

গ্রেনেডটা সরাসরি কাউকে খুন করবে না, কারণ ওটা শুধু বিস্ফো-রিত হবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে না। শত্রুদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে ও, কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগলো ওর। ভিক্টর লজে-নের মতো কসাইকে যারা সাহায্য করে তাদের জন্যে দয়া দেখানো বোকামি। তবু, নীতি বলে একটা ব্যাপার আছে।

বিস্ফোরণের শব্দ হতেই আবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রানা, ছুটলো জানালার দিকে। এক লাফে ফাঁকটা গলে ভেতরে ঢুকলো ও। দাড়িওয়ালা একজনই লোক ছিলো জানালায়, এই মুহূর্তে মেঝেতে বসে কি যেন হাতড়াচ্ছে সে। কফি টেবিলের ওপর খোলা রয়েছে রঙচঙে একটা নকশা। লোকটার চোয়াল আর সম্ভবত ঘাড়টা লাথি মেরে ভাঙার জন্যে দেড় সেকেণ্ড সময় নিলো রানা।

দাড়িটা অদ্ভুতভাবে তেরছা হয়ে গেল, কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। এতোক্ষণে দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করলো রানা। পরনে অ্যাপ্রন, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ফায়ারপ্লেসের সামনে, শিখাহীন আগুনের ওপর বমি করছে। তার নাগালের বারো ইঞ্চি বাইরে একটা অস্ত্র রয়েছে, এটাও কেজি-নাইন। মাথা ঝাঁকিয়ে বিস্ফোরণের ধকল সামলাতে চেষ্টা করছে লোকটা, লাথি মেরে তাকে অজ্ঞান করলো রানা।

কামরার চারদিকে তাকিয়ে ফার্নিচারগুলো চিনতে পারলো ও, লিলির কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা এখনো অম্লান হয়ে আছে স্মৃতিতে।

নষ্ট করার মতো সময় নেই, দেরি করলে কোকেন সম্রাটকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া হবে। লম্বা কামরাটা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছুটলো ও। হলওয়েতে পা ফেলার আগে আরেকটা কংকাশন গ্রেনেড ছুঁড়লো। বিস্ফোরণের ধাক্কা থেকে বাঁচার জন্যে আড়াল নিলো ও। বিস্ফোরণের শব্দ একটু ঝাঁকি দিলো ওকে, উজ্জ্বল আলো ধাঁধিয়ে দিলো চোখ দুটো। অন্তত তিন সেকেণ্ড পরিষ্কার কিছুই দেখতে পেলো না রানা।

হলওয়ে ধরে এগোলো ও। করিডরে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে এক লোক, আউটার ওয়াল-এর সরু জানালার দিকে মুখ। গ্রেনেডের বিস্ফোরণ তাকে দিশেহারা, উদভ্রান্ত করে রেখেছে। পিছন থেকে তার ঘাড়ে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারলো রানা।

লোকটা বিশাল, পেশীবহুল শরীর, একবার গুঙিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়লো। এক পা এগিয়ে লোকটার অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিলো রানা। এটাও কেজি-নাইন। এই সময় শব্দটা কানে ঢুকলো। হলওয়ের আরেক দিকে খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল একটা দরজা।

দোরগোড়ায় লোকটার শুধু অস্পষ্ট কাঠামো দেখতে পেলো রানা,

ওপে সেটুকুই যথেষ্ট। সুইমিং ট্রাংক, স্যাণ্ডেল আর সানগ্লাস পরা লোকটা ভিক্টর লজেন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে, আবার সাথে সাথে বেরিয়ে যাবার সময় তার লম্বা চুল ঝাঁকি খেলো। দড়াম করে নিজের পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

এক নিমেষে দরজার কাছে চলে এলো রানা। দরজার পাশে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো, তালার দিকে তাক করলো উজির মাজল। দরজার পাশে না দাঁড়ালে, ওখানে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে খানিকটা না ঘুরলে, আঘাতটা শুধু অনুভব করতো রানা, কোত্থেকে এলো দেখতে পেতো না। চোখের কোণ দিয়ে শুধু কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো ও, হাত তুলে বাধা দিতে লোকটার ঘুসি খেলো বাহুতে।

প্রচণ্ড মার খেয়েও জ্ঞান হারায়নি বিশালদেহী লোকটা, হলঘরের মেঝে থেকে উঠে এসেছে সে পেছন পেছন। রানার হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে, এ-ধরনের দশাসই বেজম্মাকে অচল করতে পারে শুধু একটা বুলেট। বাধা দিতে গিয়ে রানার হাত দুটো মুখের কাছে উঠে এলো, ওগুলো এখন আর কোনো কাজে আসবে না। মেঝে দিয়ে গড়িয়ে গেল কেজি-নাইন। উজিটা বুকের সাথে সেঁটে রয়েছে।

রানার চোখে নিঃশ্বাস ফেলছে লোকটা। এ নিশ্চয়ই সেই খুনেদের সর্দার, যার হাত দুটোকে হাতিয়ার বলা হয়। হাতিয়ার দুটো রানার মুখে ব্যবহার করছে সে। লোহার মতো শক্ত, বাঁকা আঙুল রানার চোখে ঢোকাতে চেষ্টা করলো। তাড়াহুড়ো করলো না, কারণ জানে রানার করার কিছু নেই, শুধু মাথা ঝাঁকানো ছাড়া। চোখ দুটোকে এই মুহূর্তে আঙুলের নাগালে না পেয়ে রানার মুখের মাংসে নখ ঢুকিয়ে দিলো সে, আরেক হাতের তালু দিয়ে চাপ দিলো চিবুকে। আক্রমণটা আরো মারাত্মক হতে পারতো, যদি না কংকাশন গ্রেনে-

ডের বিস্ফোরণ দুর্বল আর শ্লথগতি করে তুলতো লোকটাকে।

উপায় না দেখে নেতিয়ে পড়লো রানা, দেয়ালে ঘষা খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। পড়েই সোজা ওপর দিকে লাথি চালালো। লোকটার উরুসন্ধিতে বাধা পেলো ওর পা। গুড়িয়ে উঠলো লোকটা, ছিটকে দূরে সরে গেল। এক সেকেণ্ড সময় পেলো রানা। সময় পেলো লোক-টাও।

পরস্পরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো ওরা। দু'জনেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিয়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে। লোকটা স্থির, অচঞ্চল, যেন একটা পাথরের স্ট্যাচু। রানা হাঁপাচ্ছে। ওজনের দিক থেকে টেনেটুনে তার অর্ধেক হবে রানা। গায়ের জোরে দৈত্যটার সাথে পারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়বার তার হাতে ধরা পড়া মানে নির্ঘাৎ মৃত্যু। কৌশলে জিততে হবে রানাকে।

লোকটাকে খেপিয়ে তোলা দরকার। তারপর দৌড় খাটাবে। উদ্দেশ্য ক্লান্ত করে তোলা। ছোবল মারার ভঙ্গিতে একটা ঘুসি মেরেই পিছিয়ে এলো রানা, পিছিয়ে আসবে তা আগে থেকে বুঝতে দেয়নি শত্রুকে। ঘুসিটা আসছে দেখেও নড়লো না লোকটা, ভেবেছিল ওটা হজম করবে প্রতিপক্ষকে আটক করার বিনিময়ে। এ-ধরনের পরি-স্থিতিতে সাধারণত প্রতিপক্ষ একের পর এক ঘুসি মারতে থাকে, কাজেই নাগালের মধ্যেই পাওয়া যায় তাকে। ঘুসিটা হজম করার পর রানাকে নাগালের মধ্যে না দেখে রেগে গেল দৈত্য, বুঝতে পারলো তাকে বোকা বানানো হয়েছে। গর্জে উঠে সামনে এগোলো সে।

তৈরিই ছিলো রানা। লোকটা ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এলো, স্যাৎ করে একপাশে সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করলো ও, পাশ থেকে লাথি মারলো শত্রুর হাঁটুতে। হোঁচট খেতে খেতে নিজেকে কোনো রকমে

সামলে নিলো লোকটা। তাল ফিরে পেয়ে আবার রানার দিকে এগিয়ে এলো সে।

এবার রানা নড়লো না। প্রতিটা ঘুসি হাত দিয়ে ঠেকালো ও, লাথিগুলো লাগতে দিলো কোমরের ওপর দিকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো ও, সেটা পেতেই মোক্ষম একটা আঘাত করলো হাতের কিনারা দিয়ে লোকটার নিরাবরণ গলায়। ব্যথা পেয়ে পিছু হটছে লোকটা, পর পর তিনটে লাথি মারলো রানা তাকে। প্রথম ধাক্কায় দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল শত্রু, দ্বিতীয় লাথিটা আংশিক ঠেকালো সে, নাক দিয়ে বাতাস ছেড়ে সিধে হয়ে গেল শরীরটা, শেষ লাথিটা পাঁজরের হাড়গুলোকে মেরুদণ্ডের সাথে চেপে ধরলো।

খেল খতম।

লজেনের দরজা ভাঙতে এবার কোনো বাধা পেলো না রানা। তালায় গুলি করে ভেতরে ঢুকলো ও, জানে শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিশালদেহী খুনিটাকে সাহায্য করার জন্যে লজেন যদি থেকে যেতো, এতোক্ষণে প্রাণহীন মাংসে পরিণত হতো রানা। কিন্তু না, হোয়াইট গামার নেতা নিজের অবস্থানে অটল থাকেনি। পালিয়েছে সে।

বাড়িটার একপাশের জানালা থেকে কেবিন আর পুলটা দেখা যায়। সরাসরি জানালার সামনে না দাঁড়াবার বুদ্ধিটা এখনো রানাকে ত্যাগ করেনি। পাশে দাঁড়িয়ে পর্দা সরাতে যাবে, পর্দা ফুটো করে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট। লজেন বা তার কোনো লোক জানালার ওপর অস্ত্র তাক করে বসে আছে। কাঁচের ভাঙা টুকরো লাগলো রানার মুখে। কাঁধে একটা ধাক্কা অনুভব করলো ও, ফ্রেমের টুকরো কিনা বলতে পারবে না। তার আগে উঁকি দিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিয়েছে।

দেখলো পুলের ওপারে দ্রুত হাঁটছে এক লোক। খোঁড়াচ্ছে সে। লম্বা চুল আর সুইমিং ট্রাংক বলে দিলো লোকটা ভিক্টর লজেন। ওপরতলা থেকে লাফ দিয়ে পড়ার সময় নিশ্চয়ই পায়ে আঘাত পেয়েছে সে। মাইনফিল্ডের দিকে যাচ্ছে, যেদিকে গোলাগুলি হচ্ছে না। মাইনফিল্ড পেরিয়ে পাহাড়ে উঠে যাবার মতলব।

খুশি হলো রানা। এক ছুটে মেইন রুমে চলে এলো ও, ক্লজিট খুলে মাইনফিল্ড অ্যাকটিভেট করলো। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াবার আদেশ দিলো লজেনকে।

# সাত

---

'ডিড ইউ রিয়েলি আর্ম দিস ফিল্ড, ম্যান?'

মিথ্যে বলেনি গর্ডন উইন্টার। চমৎকার ইংরেজি বলে ভিক্টর লজেন। একটু হয়তো সেকেলে, তবে অনর্গল। ধরা পড়ার মুহূর্ত থেকে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছে সে, কিন্তু ডি. এ. এস.-এর দু'জন লোককে শান্ত করতে ব্যস্ত থাকতে হলো রানাকে। শেষ মুহূর্তে পৌঁচেছে তারা, খুন করার জন্যে অস্থির। সার্জেন্টকে সাহায্য করার জন্যে রওনা হবার পর নিজেদের একজন লোক হারিয়েছে তারা,

দলের অপর একজন আহত হয়েছে। কাজেই প্রতিশোধ নিতে চায় তারা। বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদেরকে হাসিয়েনদা সার্চ করতে পাঠালো রানা, শত্রুপক্ষের আহত বা নিহত লোকদের নিয়ে কি করতে হবে তাও জানিয়ে দিলো। ইন্টারোগেশন-এর সময় কোনো সাক্ষী রাখতে চায় না ও।

'মাঠের ওপর একবার হাঁটলেই তো পারো, ভিক্টর। সাথে সাথে জানতে পারবে সত্যি বলছি কিনা।'

কপাল আর চোখ থেকে লম্বা চুল সরালো লজেন। 'তোমার কথা আমার বিশ্বাস করা উচিত, রানা,' বললো সে। 'আমার ধারণা, এই জায়গা সম্পর্কে কিছুই তোমার অজানা নেই।'

'কারেক্টো!'

'মেয়েছেলেটা আসলে বেশ্যা,' বললো লজেন, গাল দিলো লিলি-য়ানকে।

অন্য কোনো পরিস্থিতিতে লিলিকে এভাবে অপমান করা হলে সাথে সাথে আক্রমণ করতো রানা। ধৈর্য ধরায় এতোটা পথ আসতে পেরেছে ও, জানে এই ধৈর্যই ওকে হয়তো বাকি পথটুকু নিয়ে যাবে, পৌঁছে দেবে হেনেরিক মূলারের কাছে। লিলিয়ানকে যা খুশি বলুক লজেন, রানা মাথা গরম করবে না। 'অস্ত্রটা ফেলে দাও, ভিক্টর,' শান্ত গলায় নির্দেশ দিলো ও।

সবুজ ঘাস মোড়া মাঠের চারদিকে চোখ বোলালো লজেন, যেন শুকনো ডগা সহ ঘাসের একটা চাপড়া খুঁজছে। কয়েক সেকেণ্ড পর হাল ছেড়ে দিলো সে। কাঁধ থেকে কেজি-নাইনটা নামালো, শুধু স্ট্র্যাপ ধরে সামনে পিছনে দোলাচ্ছে সেটা। 'ঠিক কোথায় আত্মহত্যাটা করবো বলে তোমার ধারণা?'

'যতোটা দূরে পারো ছুঁড়ে দাও ওটা,' বললো রানা। 'খানিকটা সম্ভাবনা আছে তুমি আহত হবে না।'

হাসলো লজেন। তার মুখটা চওড়া, হাঁসের মতো, ঠোঁট জোড়া মেয়েলি, যৌনাবেদনের কমতি নেই। মেয়েমানুষ পটাতে তার জুড়ি নেই, এ-কথা সবাই জানে। তার নামটা এতোই জনপ্রিয় যে সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের নাম ভিক্টর রাখার একটা হিড়িক পড়ে গেছে কলম্বিয়ায়। দীর্ঘদেহী সে, স্বাস্থ্যবান, নায়কোচিত চেহারা।

স্টাইলের ভক্ত ভিক্টর। কেজি-নাইনটাকে দিয়ে একটা বৃত্ত রচনা করলো সে, নিজের পিছনে নিয়ে গেল, বৃত্ত সম্পূর্ণ করার আগে ছেড়ে দিলো স্ট্র্যাপটা। অস্ত্রটা ছুটে এলো রানার দিকে, একটা আম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। ওর কাছ থেকে পনেরো গজ দূরে পড়লো সেটা, মাইনফিল্ডের ভেতর। কিছুই বিস্ফোরিত হলো না। 'সত্যি তুমি গুণী লোক, রানা,' বললো সে। 'তোমার সাহস আছে। ভালো লোকের চোখে পড়লে কলম্বিয়ায় তুমি উন্নতি করতে পারতে।'

'আমার ক্যারিয়ার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বললো রানা। 'তুমি বরং নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করো। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মাঠটা থেকে তোমাকে বেরোতে দেয়া হবে, নাকি ওখানেই তোমার অস্তিত্বের ইতি ঘটবে।'

আবার নিজের চারদিকে তাকালো লজেন। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাবার সময় শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপালো। এমনকি ডান পা-টাও সামান্য জায়গা বদল করলো। এ-সবের মানে হলো, তারও সাহসের কোনো অভাব নেই। 'আপোসে রাজি আছো, রানা? কি চাই তোমার? ক্যারিবিয়ানে আমার একটা দ্বীপ আছে। ভালো শিকার পাওয়া যায়। ...র একটা দোতলা

বাড়ি আছে, বাইশটা কামরা ওতে। জেটিতে ইয়ট দেখতে পাবে। আরো দুটো ছোটো বোট আছে। গাড়ি আছে। বলো তো সবসুদ্ধ ওটা তোমাকে আমি দান করতে পারি। কাগজ-পত্র সব আমি তৈরি করে দেবো। বলো তো সাদা কাগজে সই করতেও আপত্তি নেই। সব বুঝিয়ে দেয়ার পর এখান থেকে হেঁটে চলে যেতে পারবো আমি, ঠিক আছে?'

'হাঁটতে তুমি এখনো পারো, লজেন।'

'না, পারি না,' বললো লজেন।

খুশি হলো রানা, বিপদটা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই লজেনের। 'তোমার তো জানার কথা যে বিচারের জন্যে তোমাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে,' বললো ও, ধীর পায়ে মাইনফিল্ডের কিনারার দিকে হাঁটছে। 'তোমার বিরুদ্ধে রায় হবে। কঠিন শাস্তি ভোগ করবে তুমি, লজেন।'

'তুমি যখন বলছো, বিশ্বাস না করে উপায় কি।'

'হালকাভাবে নেয়ার ভান করো না, লজেন। তোমার সি. আই. এ. বন্ধুরা এই বিপদে কোনো সাহায্যে আসবে না। এ-ব্যাপারে আমি তোমাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

সি. আই. এ.-র নাম শুনে প্রতিক্রিয়া হলো লজেনের। তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে মনে হলো, কি যেন চুষছে সে। ভঙ্গিটা থেকে রানার প্রতি অবহেলা, সবজান্তার ভাব আর একঘেয়েমি প্রকাশ পেলো। তার কণ্ঠস্বরেও এই সব ভাবের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করলো রানা। 'সেটা আমার সমস্যা, রানা। তুমি বরং নিজের কথা বলো—এতে তোমার স্বার্থ ঠিক কোন্‌খানটায়, জানতে পারি?'

কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দরকার রানার। সবচেয়ে ছোটো প্রশ্নটা দিয়ে

শুরু করলো ও। 'সি. আই. এ.-র হয়ে কি কাজ করছো তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকালো লজেন। 'এ-সব গুরুত্বহীন বিষয়,' বললো সে। 'ব্যবসা।'

'টাকা,' বললো রানা। 'সি. আই. এ.-কে তুমি টাকা দিয়েছো।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো লজেন, দূর থেকে কোনো রকমে বোঝা গেল। 'ওরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ছে, রানা। কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ফাণ্ড দরকার ওদের।'

'সি. আই. এ.-র মাধ্যমে কণ্ট্রাদের তুমি টাকা দিয়েছো।'

'টাকাটা কিভাবে খরচ করতে হবে সে-ব্যাপারে আমি কোনো শর্ত দিইনি,' বললো লজেন। 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তিনি একজন কণ্ট্রা। আমি, ভিক্টর লজেন, একজন কণ্ট্রা। তুমি, মাসুদ রানা, অন্তরের অন্তস্তলে একজন কণ্ট্রা।'

'আমি কি তুমি তা জানো না,' বললো রানা। 'যেমন জানো না, যদিও তার সাথে কাজ করেছো তুমি, ডেভিড গোল্ডব্লাট সম্পর্কে। চাঁদার বিনিময়ে তোমাকে সে ঘণ্টা দিয়েছে।'

'কে এই ডেভিড গোল্ডব্লাট?' জিজ্ঞেস করলো লজেন।

'তুমি সম্ভবত তাকে শকুন বলে চেনো। এবার তুমি কনডর গ্রুপ সম্পর্কে কিছু বলো, লজেন।'

'তুমি একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট,' বললো লজেন। 'তোমাকে নতুন আর কি বলার থাকতে পারে আমার?'

'তোমার সাথে তাদের সম্পর্ক কি?' জানতে চাইলো রানা।

'আমি তো হোয়াইট গামা,' সাবলীলভঙ্গিতে বলে গেল লজেন। 'দলের সবাই একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। আমাদের দৃষ্টিতে, গোটা দুনিয়া বামপন্থী আদর্শের হুমকির মধ্যে রয়েছে। কেন্দ্রীয় ভাবে

শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে ছনিয়াটাকে আমরা শান্তির নীড় বানাতে পারি··· ।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না তুমি, লজেন।'

'দিয়েছি তো,' জোর দিয়ে বললো লজেন, প্রিয় বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়ে উৎসাহ বোধ করছে সে। 'আমরা যারা কনডর গ্রুপে আছি তারা সবাই প্রথমে এই এলাকায় ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যে-কোনো মূল্যে সাফল্যের মুখ দেখবো আমরা।'

এ-ধরনের ভাষণ আগেও শুনেছে রানা, তবে কোথায় মনে করতে পারলো না। মার্কিন সরকারের একজন এজেন্ট কনডর গ্রুপকে সাহায্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নিজের চাকরি রক্ষা করার জন্যে, সেই সাথে দেশপ্রেমের নাম করে স্বদেশের বিরাট ক্ষতি করছে। পুরনো গল্প, ডেভিড গোল্ডব্লাট হলো সেই পুরনো কাহিনীর সবচেয়ে ঘৃণ্য পরিচ্ছেদ। 'তোমাদের কর্মসূচীতে সহায়তা পাবার আশায় কতো টাকা দিয়েছো শকুনকে?'

'প্রশ্নটা তোমার করা উচিত আমার অ্যাকাউন্টস অফিসারকে,' অলস ভঙ্গিতে বললো লজেন। 'তবে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম নয়, এটুকু আমি জানি।'

দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 'টাকার বদলে একটা রশিদ নেয়া উচিত ছিলো তোমার, লজেন। টাকা দিয়ে শুধুই বিপদ কিনেছো তুমি।'

'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক, রানা।'

বলছে বটে, কিন্তু রানার কথা বিশ্বাস করে না সে। এখন না করলেও, পরে করবে। ইরান থেকে খবর আসুক। শুধু তথ্য সংগ্রহ বাদে, আর সব কাজ করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে সি. আই. এ.-র। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে মঙ্গলজনক হবে সেটা। স্বদেশের স্বার্থে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। সি. আই. এ.-র সহায়তা না পেলে কোকেন সম্রাটের মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে, রানার জন্যে ব্যাপারটা উপরি পাওনা। ক্ষতিটা টের পাবে লজেন, কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকবে না তার। 'কনডর গ্রুপের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিলো কে? ববি মুয়েলার, তাই না?' জানতে চাইলো রানা।

'হ্যাঁ,' বললো লজেন।

'মিটিংটায় তুমি না থাকলেই ভালো করতে, লজেন। ইন্টেলিজেন্স নিয়ে খেলা করা তাদেরই মানায় যারা ব্যাপারটা বোঝে। যেমন তোমার বাবা, তোমার আত্মীয় ভদ্রলোক।'

টোপটা খেলো না লজেন। রানার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে। 'আমার বাবা বুড়ো হয়েছেন, তিনি অসুস্থ। আলোচনায় তাঁকে টেনে না আনলে আমি খুশি হবো।'

'বোঝার চেষ্টা করো, লজেন। তুমি বেঁচে থাকলে আমার কোনো লাভ-লোকসান নেই। অন্য লোকেরা তোমাকে ড্রাগ, দুর্নীতি, কার্টেলের গোপন তথ্য ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করবে। এ-সব প্রশ্নের উত্তর পেলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করবো, কিন্তু আমার প্রধান উদ্দেশ্য এগুলোর উত্তর পাওয়া নয়।'

'তুমি একজন বিশেষজ্ঞ,' বললো লজেন। 'এটুকু পরিষ্কার। কি চাও তুমি, রানা?'

'তোমার আত্মীয় ভদ্রলোক সম্পর্কে বলো। তোমার খালু হন, তাই না? আমরা যাকে রলফ মুয়েলার বলে চিনি।'

প্রথম দিকে সাহস দেখিয়ে নড়াচড়া করলেও, আলোচনা শুরু হবার

পর নিজের জায়গায় সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আছে লজেন। 'পরিবার নিয়ে আমি কোনো আলোচনায় রাজি নই,' দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলো সে।

লজেন হয়তো সত্যি অটল থাকবে তার সিদ্ধান্তে, যদিও রানা তা মনে করে না। উজিটা তুলে গুলি করলো ও, মুখে কিছু বললো না। লজেনের সামনে, এক গজ দূরে, দশটা বুলেটের একটা ঝাঁক ঘাসের ভেতর সেঁধিয়ে গেল।

মারাত্মক কিছু ঘটলো না। একটা বুলেট ঘাসের ভেতর নিরেট কিছুতে লাগলো, ছিটকে উঠলো সেটা, বাতাসে শিশ কেটে বেরিয়ে গেল। লজেনের অর্ধ-নগ্ন শরীরে মাটি লাগলো।

মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এমন একজন লোকের কাছে ঘটনাটা হয়তো তেমন কিছু নয়, তবে লজেনের প্রতিক্রিয়া হলো। শিউরে উঠলো সে, জায়গা বদলের জন্যে পা তুললো। তারপর হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, মনে পড়ে গেছে নড়ার উপায় নেই তার। মুখ রক্ষার জন্যে গা থেকে মাটির কণা ঝাড়লো সে। 'কাজটা তাহলে তোমারই, তাই না?' মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমার প্লেন আর স্ট্যাচু ধ্বংস করেছো।'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'আমি জানতাম, তোমারই কাজ হবে ওটা। হয় তোমার কাজ, নয়তো কোনো উন্মাদের।'

'কি করে জানলে?'

হাসলো লজেন। হাসিটার মধ্যে রানা যা দেখলো, নির্ঘাৎ মেয়ে-গুলোও তাই দেখতে পায়। হাসির মধ্যে এতো নিষ্ঠুর ভাব থাকতে পারে, ভাবা যায় না। 'ব্যাপারটা তুমি আর আমি বুঝি, রানা,' বললো সে। 'শক্তিশালী কোনো লোক যদি ধ্বংস করতে চাও, প্রথমে

তার সেন্টিমেন্টের ওপর আঘাত হানো।'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে তোমার আর আমার মধ্যে বিস্তর মিল আছে।'

'একটা পর্যায় পর্যন্ত।'

'সেই পর্যায়টা কি?'

'টাকার বিনিময়ে মানুষকে আমি খুন করি না,' বললো রানা।

আবার হাসলো লজেন। 'টাকা নয়, তোমার বোধহয় মানসিক সন্তুষ্টি দরকার,' বললো সে। 'মানুষকে ধাওয়া করে তৃপ্তি পাও তুমি।'

'ধাওয়া পর্ব শেষ হয়েছে, লজেন। আমার শুধু জানতে বাকি আছে, তোমার খালুর ঠিকানাটা।'

জবাব দিলো না লজেন।

উজিটা আবার তুললো রানা। আবার দশটা গুলি করতো ও, এবার ডান দিকে, কিন্তু তার আগেই মুখ খুললো লজেন।

'ওয়েট, ম্যান!'

'জলদি, লজেন। বলো, হেনেরিক মুলারকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

নামটা শুনে একটুও অবাক হলো না লজেন। মনে হলো, জানে সে। সম্ভবত বড় হবার পর থেকেই জানে। তার মৌনতা অর্থবহ হয়ে উঠলো রানার কাছে। 'না জানলে বলবো কিভাবে। আমার খালু চলে গেছেন। যখন খুশি আসেন তিনি, কেউ বলতে পারে না কখন চলে যাবেন। চিরকাল এইরকমই তিনি। গ্রেট ম্যান বলতে যা বোঝায়, আমার খালু তাই। মহৎ কোনো মানুষকে প্রশ্ন করা যায় না।'

'বিশ্বাস করলাম না, লজেন। জানো তো, আমার হাতের এই ব্যারেল থেকে সত্যি কথাটা বেরিয়ে আসবে?' উজি থেকে আরো এক ঝাঁক বুলেট ছুটলো। সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিচ্ছে রানা, যে-কোনো

দিকে একজোড়া মাইনের মাঝখানে খুব বেশি ফাঁক থাকার কথা নয়। লজেনের ডান দিকে লাফিয়ে উঠলো মাটি। টমাস কালভিনের রেখে যাওয়া একমাত্র শত্রু এক পায়ে লাফালো, পাখির মতো।

এবারও লজেনের ভাগ্য বলতে হবে, কিছু ঘটলো না। ভাগ্য রানারও, কারণ লজেন মারা গেলে দরকারী একটা তথ্য থেকে বঞ্চিত হবে ও। লজেনের চুলে, সারা শরীরে মাটি লেগেছে। বাতাসে উড়ছে ঘাসের ছেঁড়া ডগা আর পোকা। তবে কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি। রক্তও ঝরেনি এক ফোঁটা। সঠিক উত্তরটা এবার পেতে হবে রানাকে, তৃতীয়বার ঝুঁকিটা নিতে রাজি নয় ও। 'কোথায় তিনি, ভিক্টর? জবাব দাও, মায়ামি বীচ দেখার জন্যে বেঁচে থাকবে তুমি। বুড়ো বয়সটা নাকি ওখানে কাটাতেই পছন্দ করে কলম্বিয়ানরা।'

রানার দিকে সরাসরি তাকালো লজেন। 'এতোক্ষণে একটা প্রস্তাব দিচ্ছো তুমি। শর্তগুলো কি, রানা?'

'প্রস্তাবটা তোমার জীবন, লজেন। সেটার কি দাম, তুমি ঠিক করবে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, মৃত্যুর মুখোশ পরা একটা ভাঁড় তুমি।'

অপমানটা সহজে হজম করতে পারলো না কোকেন সম্রাট। বিপথ-গামী প্রতিভার মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কে এই প্রথম আভাস পেলো রানা। চিবুক উঁচু করে রানার দিকে তাকালো সে, যেন দিগ্বিজয়ী একজন বীর, মনটা তার পাষাণ। তার মাংসল ঠোঁট দুটো সামান্যই নড়লো, নিচু গলায় কথা বললো সে। 'ইচ্ছে করলে আমাকে খুন করতে পারো, রানা। কিন্তু মনে রেখো, যে-কোনো মানুষকে খুন করানো যায়। আমি জানি, মেয়েদের প্রতি তুমি খুব নরম। আমি বিশেষ করে সেই বেশ্যাটার কথা বলছি। ভেবো না তাকে নিরাপদে

লুকিয়ে রাখতে পেরেছো। ভেবো না তা সম্ভব। আমি যদি মারা যাই, ববি মুয়েলারের স্ত্রী, নিজের পরিচয় সে যা-ই দিক, যেখানেই সে লুকিয়ে থাকুক, তাকেও মরতে হবে।'

হুমকিটা শোনার সময় বুকের রক্ত ছলকে উঠলো রানার। খুনের একটা নেশা অনুভব করলো ও। আরেকটু হলে ট্রিগার টেনে ধরেছিল। কিন্তু না, লোকটাকে ওর জীবিত দরকার। কারণ টমাস কালভিন ওকে জীবিত ধরতে চেয়েছিল। আরেকটা কারণ, লিলি সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। 'ভিক্টর, তোমার কাছ থেকে একটা কিছু পেতে হবে আমাকে। তা না হলে তোমার আর আমার কথা ছাড়া বাকি সব আমি ভুলে যাবো।'

চেহারায় ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে হাসলো লজেন। শব্দগুলো উচ্চারণের সাথে তার ঠোঁট ঘন ঘন বেঁকে গেল, 'আমার খালু এই মুহূর্তে অনেক দূরে রয়েছেন, যেখানে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। তিনি আছেন গভীর এক জঙ্গলে, একটা বাংকারে।'

বাংকারে। জঙ্গলের ভেতর। কিভাবে যেন রানা জানতো, উত্তরটা এরকম একটা কিছুই হবে।

# আট

আমাজোনাস টেরিটরি, কলম্বিয়া। ১৬ই মার্চ, ১৯৬১।

ইহুদি ভীতি? তাদের দেখে পালানো? হেনেরিক মুলারের কাছে এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। ভয় না পেয়ে উপায় কি, ইসরায়েলিরা আইখম্যানকে আর্জেন্টিনা থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। একা শুধু হেনেরিক মুলার নন, নাৎসী অপরাধী যারা বেঁচে আছে তাদের সবাই আতংকিত হয়ে পড়েছে। আরো বড় দুঃসংবাদ, ইসরায়েলে বিচার করা হবে আইখম্যানের। ওখানে তার অপরাধী বিবেক প্রদর্শন করা হবে। কোনো সন্দেহ নেই আইখম্যানকে ফাঁসিতে ঝোলাবে ইহুদিরা, কিন্তু শেষ দয়াটা দেখানোর আগে তাকে নিঙড়ে সমস্ত তথ্য বের করে নেবে। এই মুহূর্তে ঠিক সেই কাজটাই করা হচ্ছে।

মুলার ভাবতে চেষ্টা করলেন, ইসরায়েলিরা ঠিক কি পদ্ধতি ব্যবহার করছে। টরচার তো বটেই, তবে স্থূল ধরনের শারীরিক নির্যাতন নয়। সান্ত্বনা এইটুকু যে আইখম্যান তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানাতে পারবে না, শুধু বলতে পারবে চার বছর আগে গেস্টাপো প্রধানকে

বুয়েনস আয়ার্সে দেখেছিল সে। এর বেশি যাতে আইখম্যান জানতে না পারে, সেদিকটায় খেয়াল রেখেছিলেন তিনি।

এক অর্থে, এটাও কম বিপজ্জনক তথ্য নয়। আইখম্যান ধরা পড়ায় যে গুজবটা এতোদিন শুধু শোনা গেছে, কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তা সত্যি বলে ধরে নেয়া হবে—নাৎসী হাইকমাণ্ডের সদস্যরা বিধ্বস্ত জার্মানী থেকে পালিয়েছে, তাদের মধ্যে আজও অনেকে বেঁচে আছে। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও, তারা প্রায় সবাই মুলারের প্রতিষ্ঠিত পথ ধরে অর্থাৎ বিশপ হুডালের সহায়তা পেয়ে নিরাপদে পালাতে পেরেছে। সন্দেহ নেই, ইসরায়েলিরা সে-কথা ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছে, অন্তত আংশিক হলেও। হেনেরিক মুলার সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানার কথা তাদের। আর আইখম্যান যদি সত্যি সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তার সম্পর্কে ইহুদিরা কিছুই জানতে পারবে না।

তবে নাৎসী ধরার জন্যে শিকারীরা সদলবলে বেরিয়ে পড়েছে। দক্ষিণ আমরিকায় জার্মান উচ্চারণে কথা বলে, এমন প্রতিটি লোককে সন্দেহ করা হচ্ছে। এদিক থেকে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন মুলার। তাঁর আসল পরিচয় জানে শুধু সাঁতেলা লজেন, তাঁর ভায়রা। জীবন দিয়ে হলেও তাঁর পরিচয় গোপন রাখবে সাঁতেলা। প্রথম জীবনের কথা নতুন স্ত্রী বা সন্তানদের কাউকে জানতে দেননি মুলার।

ছেলেদের সাথে একটা আলোচনা হওয়া দরকার, বুঝতে পারছেন তিনি। সিটাডেল-এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রলফ আর ববি প্রজেক্টটা সম্পর্কে জানে, কারণ ওদের মা চিঠিতে জানিয়েছে, বুড়ো বয়েসে তোমাদের বাবা একটা পাগলামি করছেন। বাড়ির আরাম-আয়েশ ছেড়ে কলম্বিয়ার শেষ মাথায়, অভিশপ্ত জঙ্গলের ভেতর আস্তানা তৈরি করছেন তিনি।

জনবসতি নেই, এমন বিশাল এলাকা রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায়। যুদ্ধের আগে থেকেই তা জানতেন মুলার। তবে সে-সব এলাকার কোনো দাম নেই। যে উচ্চতায় সহজে প্রাণ ধারণ সম্ভব, সেখানকার প্রতিটি ইঞ্চি জমিতে গত এক শো বছর ধরে চাষবাস করা হচ্ছে। ফেলে রাখা হয়েছে শুধু জঙ্গল।

কাজেই নিজের জন্যে জায়গা পাবার আশা নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলেন মুলার। এলাকাটা অক্ষত নয়, পরিত্যক্ত। একবার নয়, দু'বার পরিত্যাগ করা হয়। কয়েক শো বছর আগে মিশনারিরা এসেছিল এখানে, আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের যীশুর মন্ত্রে দীক্ষা দিতে। শেষবার এদিকটায় জনবসতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে রাবার শ্রমিকরা।

মিশনারিরা জঙ্গলের ভেতর একটা গির্জা তৈরি করে। কিছুদিন বেশ ভালোই কাজ হয় তাদের প্রচারণায়, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন স্পেনের রাজা উপলব্ধি করলেন, আদিবাসীদের মধ্যে মিশনারিদের প্রভাব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নিজের সাম্রাজ্য থেকে তাদের সবাইকে তিনি বিতাড়িত করলেন। গোটা এলাকা খালি হয়ে গেল। কয়েক শো বছর কেটে যাবার পর জঙ্গলে আবার ফিরে এলো আদিবাসীরা, রাবার সংগ্রহ করতে এসে খুন হবার জন্যে। ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যবসায়ীরা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের হাজার হাজার শ্রমিককে হত্যা করলো। আবার খালি হয়ে গেল লাস আনিমাস নামের জঙ্গলটা।

সবশেষে এলাকাটার ওপর নির্দয়তার ছাপ রাখলো প্রকৃতি। জঙ্গলটাকে ঘিরে আছে সাপের মতো একটা নদী, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই মোড় ঘুরে পিছন দিকে ফিরে গেছে বহুবার, সাপ যেন নিজের লেজ কামড়াবার কসরৎ করছে। প্রতিটি বর্ষা মরশুমে ঘটেও ঠিক তাই। নিজের খাদ ছেড়ে মাটির ওপর উঠে আসে নদী, কয়েক

মাইল দূরে তৈরি করে আরেকটা জলাশয়। নতুন লেকের পানি লোনা, লেকের দু'পাশে কোনো ফসল জন্মায় না, ওদিকে কেউ আসা-যাওয়াও করে না।

একজন বিশপের সাহায্য না পেলে হেনেরিক মুলার কোনো দিন গির্জাটা খুঁজে পেতেন না। নানা দিক থেকেই তাকে একজন সুবন্ধু বলে মনে করার কারণ আছে। বিশপ লোকটা ক্রোয়াটিয়ার ডিকটেটর যুগোশ্লাভ দেশপ্রেমিক অ্যান্টন পাভেলিক-এর অনুসারী। কলম্বিয়ায় বসবাস করছে সে, গোপন করার মতো নিজেরও অনেক কিছু আছে তার। সার্বদের ওপর কম নির্যাতন চালায়নি সে।

জায়গাটা নির্বাচিত করার পর নানারকম সমস্যা দেখতে পেলেন মুলার। প্রথম সমস্যা, শ্রমিকের অভাব। চার্চের দশ মাইলের ভেতর চল্লিশজনের বেশি মানুষ নেই। তাদের মধ্যে আবার বেশিরভাগ মেয়ে-মানুষ, শিশু আর অথর্ব। সমর্থ বারোজন লোক দরকার হলে এলাকার বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে। সবচেয়ে কাছের শহর পুয়ের্তো অ্যাসিস। লোকগুলোকে আনা হলো মোটা পারিশ্রমিক আর বোনা-সের লোভ দেখিয়ে।

ভালোভাবেই শুরু হলো কাজ। চার্চটা ইট আর পাথর দিয়ে তৈরি, নদী থেকে এক হাজার গজের মধ্যে একমাত্র ওটাই উঁচু মাটি দখল করে আছে। ভিতটা পনেরো ফুট গভীর, যথেষ্ট চওড়াও করা আছে। মাটি খুঁড়তে গিয়ে ভিতের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, সেই সাথে পাওয়া গেল মানুষের কংকাল, শয়তানের একজোড়া পাথুরে মূর্তি আর একটা বাদুড়।

চার্চের সামনের দিকটা নতুন করে তৈরি করলেন মুলার। বেল-

টাওয়ার যে পাথর দিয়ে তৈরি, সেই পাথরই ব্যবহার করা হলো। নতুন কয়েক সারি ঘরও তৈরি করা হলো। চার্চের মুখ থেকে পিছন দিকে তিন ফুট জায়গা খালি রাখা হলো, গোটা স্থাপনাকে ঘিরে থাকলো গভীর একটা ড্রেন। জেনারেটর থেকে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা থাকায় স্যাঁতসেঁতে ভাব বা শ্যাওলা জমার ভয় নেই।

তবু, চার্চের ভেতর বাতাসটা বদ্ধ বাতাস। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি ভেনটিলেশন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। দম আটকে কিভাবে মানুষকে মারতে হয়, তাঁর চেয়ে ভালো আর কে জানে? ঘটনাটা এখনো মুলার স্মরণ করতে পারেন—আইখম্যানকে পোলাণ্ডে পাঠিয়েছিলেন তিনি, ইহুদি-দের বিরুদ্ধে পদ্ধতিটা কি রকম কাজ করছে দেখে রিপোর্ট করার জন্যে। তাঁর জানার ইচ্ছে ছিলো, নতুন কেমিকেল, জাইক্লন বি কাজ শুরু করতে কতোটা সময় নেয়।

ইহুদিদের ওপর একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে গেছে আইখম্যান, কোনো সন্দেহ নেই তার ওপরও ইসরায়েলিরা এখন একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে যাবে। রিপোর্টে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো লিখতো সে। কাজটা যাদেরকে দিয়ে করানো হচ্ছে, তাদের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিতো সে। গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে যারা মারা যাচ্ছে, একেবারে শেষ দিকে, তাদের হাত-পা নাকি জীবিতদের মতোই কোমল থাকতো। মানুষের স্তূপ, একটার ওপর আরেকটা, দেয়াল বেয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, শুধুই উঠে যাচ্ছে বা ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। নিচের লোক-গুলো চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরছে। তারা হয় শিশু, নয়তো নারী, কিংবা হয়তো বৃদ্ধ। যারা ওপরে উঠতে পারে, অবশ্যই তারা শক্তিশালী—শক্তি আর কৌশল ব্যবহার করে এক কি দুই মিনিট হয়তো বাড়াতে পারে নিজেদের আয়ু।

যেন ওই দুই-এক মিনিট সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চাশে না পড়লে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেন না মুলার। এই বয়েসে পৌঁছে জীবনের প্রতি তাঁর নতুন প্রেম জন্মায়। সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন তিনি, স্বাস্থ্যটা চমৎকার রেখেছেন। বিপুল টাকার মালিক। আর দশজন মানুষের মতোই নিরাপদ জীবনযাপন করছেন। নিজস্ব ব্যাপারে ক্ষমতাবানও তিনি। সুখীও বটেন। আগে কখনো জীবন আর দুনিয়াটাকে এতো ভালো লাগেনি তাঁর।

তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর বয়স ষাট। তখনো তিনি সুস্থ ও সবল। নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু আর্জেন্টিনা থেকে খবর এলো, আইখম্যান ধরা পড়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে একজন ইহুদি হয়ে যান হেনেরিক মুলার। যাদের শিকার করা হয়েছিল, তাদের একজন।

ইহুদিদের মতো তাকে খেদিয়ে বেড়ানো হবে, তাড়া খেয়ে ছুটবেন তিনি, জনসমক্ষে অপমানজনক মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে তাঁর, এ-সব তিনি ভাবতেও পারেন না। কাজেই তিনি কাজ শুরু করলেন। নিজেকে রক্ষার কাজ। নিজেকে নাগালের বাইরে রাখার কাজ।

তিনি ছিলেন এসএস গ্রুপেনফুয়েরার, দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে সফল সিক্রেট সারভিসের নেতা। সারাটা জীবন গোপনীয়তাকে পুঁজি করে একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছেন। রহস্য পাহারা দিয়েছেন, রহস্য ভেদ করেছেন। সবই একটা আদর্শের স্বার্থে। সে আদর্শ আজ ইতিহাস হয়ে আছে বলে বিশ্বাস করেন তিনি।

তাঁর বিশ্বাস, থার্ড রাইখ কোনো পাপ বা অন্যায় করেনি। নাৎসীরা যা করেছে তা দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যে, রাজনীতির স্বার্থে করেছে। তাদের প্রোগ্রাম ছিলো সুষ্ঠু ও হিসেবী। ঈশ্বর জানতেন, ইহুদিরা

দুনিয়ার বুক থেকে কোনোদিনই নিশ্চিহ্ন হবে না।

ইহুদিরা যেমন অস্তিত্ব হারাবে না, তেমনি দুনিয়াতে কিছু লোক চিরকালই থাকবে যারা অপরের হয়ে মাটি কাটবে, সেই মাটির তলায় দেয়াল তৈরি করবে নিজেদের জ্যান্ত কবর দেয়ার জন্যে। বেশিরভাগ নিগ্রো শ্রমিকদের কাজে লাগান মুলার, তাদেরকে জানান পরীক্ষামূলক-ভাবে একটা বাংকার তৈরি করতে চান তিনি। হাসতে হাসতে তাদের বলেন, বোনাসের জন্যে নিজেদের কর্মদক্ষতা দেখাতে হবে তাদের। তাই, তাঁর হাসির খোরাক যোগানোর জন্যে, হ্যাচওয়ের দরজা নিচে থেকে বন্ধ করে দিলো তারা।

ওদের ভবিষ্যৎ আগেই নির্ধারণ করেছিলেন মুলার। তুচ্ছ মানুষ ওরা, এতোদিন বেঁচে আছে এই তো ওদের ভাগ্য। এরকম মানুষ চিরকাল থাকবে দুনিয়ার বুকে, ইহুদিদের মতো, এদেরকে বিদায়ও নিতে হবে অকালে, সেটাই নাকি প্রকৃতি ও নিয়তির বিধান। নিকৃষ্ট নিপাত যাবে, টিকে থাকবে শুধু যারা শ্রেষ্ঠ।

হুইলটা ঘোরালেন মুলার। বাংকারের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এর-পর যা ঘটলো, বহু বছর আগে দেয়া আইথম্যানের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়। শ্রমিকরা মারা গেল, তারপরও তাদের শরীর জীবিত মানুষের মতোই নরম থাকলো। বুনো শিকড়ের মতো জড়াজড়ি করে পড়ে থাকলো তাদের লাশ। এখানেও শক্তিশালীদের নিচে চাপা পড়লো দুর্বলরা। নিজেদের বর্জ্যের সাথে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকলো তারা, দেখে মনে হবে শেষ মুহূর্তে পরস্পরের সাথে লড়াই করেছে।

হেনেরিক মুলারের মতো ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ আছে, আছে দায়িত্ব। ষাট বছর বয়েসে আগের সেই শক্তি আর নেই তাঁর। সাতটা লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া, পরিষ্কার করা, পচন ঠেকানোর জন্যে ওষুধ

মাখানো, নদীতে যাবার পথে গাছের উঁচু ডালে লাশগুলো ঝোলানো, এতো সব করতে হলে তাঁর দম ফুরিয়ে যাবে।

প্ল্যানটায় তিনি কোনো খুঁত রাখেননি। কাজ শুরু হবারও আগে কয়েক ড্রাম ঈথার আর ফরমালডিহাইড আনিয়ে রেখেছেন। দু'মাস আগে কিনে রেখেছেন গ্যাস ক্রিস্টাল। এ-সব তিনি বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে করেছেন। তিনি জানেন, মৃত্যুর চিহ্ন দেখলে ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব জাগে ইণ্ডিয়ানদের মনে। মাথার ওপর লাশ ঝুলতে দেখলে, কুসংস্কারের হাতে বন্দী আদিবাসীরা সিটাডেল থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকবে। কাজেই চিরকাল অজানাই থেকে যাবে মুলার রহস্য।

# নয়

গোটা কলম্বিয়ায় আলিজান আকরামের বাগানটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ আর নিরিবিলি বলে মনে হয়েছে রানার। ভদ্রলোকের আতিথেয়তা ভোলার মতো নয়। তাঁকে আরো যে কারণে ভালো লাগলো রানার, ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার পরও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ থাকার মতো উদারতা তাঁর আছে। শুধু ভদ্রলোকের চেহারা ও ব্যবহারে নয়, তাঁর বিলাসবহুল বাড়িটাতেও পবিত্র একটা পরিবেশ

লক্ষ্য করার মতো। শেষবার এখানে রানার আসার পর যা যা ঘটেছে, সে-কথা মনে রেখে আলোচনার জন্যে বাড়িটাকে আদর্শ বলতে হয়।

'কলম্বিয়ার জঙ্গল বিশাল একটা ব্যাপার,' আলিজান আকরাম বললেন। 'দেশের এক তৃতীয়াংশ। ওখানে একজন লোক লুকিয়ে থাকলে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। হোক সে শ্বেতাঙ্গ।'

'খুঁজে তাকে আমি ঠিকই পাবো,' বললো রানা। 'সব মানুষই চিহ্ন রেখে যায়। এলাকাটা যতো দুর্গম হবে, চিহ্ন মুছে ফেলা ততো কঠিন। আমি জানি, মুয়েলারকে প্লেন বা বোটে আসা-যাওয়া করতে হয়।'

'শুধু এটুকু জানো তুমি?'

'এখন পর্যন্ত।'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। একটু পর বললেন, 'তুমি কি পারো না পারো, সে-প্রশ্ন আমি তুলছি না, রানা। রাহাতকে আমি চিনি বলে তোমাকে চেনাটা আমার জন্যে খানিকটা সহজ হয়েছে। কঠিন একটা কাজে অযোগ্য কাউকে পাঠাবে না সে। তবু, আরো তথ্য না পেলে তুমি এগোবে কিভাবে? আমি ভাবছি…।'

'জ্বী, বলুন?'

'ভিক্টর লজেনকে তুমি আটক করে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছো, আমাদের সরকার স্বভাবতই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি সাহায্য চাইলে ওরা খুশি হবে।'

সত্যি হলে কি ভালোই না হতো, ভাবলো রানা। কিন্তু একটা হেলিকপ্টারের প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু আদায় করতে পারেনি ও। কর্নেল বেনিন মুখ হাঁড়ি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

লজেনের গ্রেফতার ডি. এ. এস., ডি. ই. এ. থেকে শুরু করে

বোগোটা আর ওয়াশিংটনের মাঝখানে যতো ইন্টেলিজেন্স সংস্থা আছে তাদের সবার জন্যে সুসংবাদ বয়ে এনেছে। কলম্বিয়ান কর্তৃপক্ষ জেরা শেষ করার পর যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে খুনিটাকে। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানোর পর কলম্বিয়ান কর্তৃপক্ষ রানার সাথে এমন আচরণ শুরু করে, যেন আর কোনো কাজ বাকি নেই। 'আমি ওদেরকে মুলারের কথা বলতে পারি না,' আলিজান আকরামকে বললো রানা। 'সি. আই. এ. জানতে পারলে আমার বেঁচে থাকা দায় হয়ে উঠবে। কলম্বিয়ায় আরো শত্রু আছে আমার। ক্ষমতা থাকলে ডি. ই. এ.-র এডওয়ার্ড বার্ন এরইমধ্যে এই দেশ থেকে বের করে দিতো আমাকে।'

এই প্রথম উদ্বেগ আর অস্বস্তিবোধ করলেন আলিজান আকরাম। 'মিঃ বার্নের মধ্যে দুরদৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করছি আমি, অকৃতজ্ঞ কিনা সে-প্রশ্ন নাহয় নাই তুললাম।'

'খাঁটি বুরোক্র্যাট,' বললো রানা। 'তার পাহারা দেয়ার সময় ধরা পড়েছে চোর, তা-ও একজন বিদেশীর হাতে। কৃতিত্বটা সেই পাবে, জানে সে। লাশগুলোর দায় চাপবে আমার ঘাড়ে। আমি আরো একটা ভালো কাজ করে ফেলি, তা সে চাইবে না।'

কিছু বললেন না বৃদ্ধ, পুলের ওপারে, লনের ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাঁর দেখাদেখি রানাও তাকালো। পাখিটা ছোটো, কিন্তু তার লেজটা বিশাল, বহু-রঙা। ওড়ার বা গা-ঢাকা দেয়ার কাজে কিভাবে ওটা সাহায্য করে বুঝতে পারলো না রানা। লেজটা মনে হয় অলংকারবিশেষ, বিপজ্জনক একটা কিছু হিসেবে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

বাগানে, রঙিন ফুলের সাথে মিশে গেল পাখিটা। রানার দিকে তাকালেন আলিজান আকরাম। 'ক'দিন আগে তোমাকে যখন খবর

দিলাম, ভেবেছিলাম কয়েকটা তথ্য পেলে তোমার উপকার হবে। এখন আমি অতোটা নিশ্চিত নই।'

'বলুন, প্লিজ। কি ধরনের তথ্য?'

'রাজনীতি সম্পর্কে,' তিক্ততার সাথে বললেন আলিজান আকরাম। 'আমি এক লোককে চিনি, কলম্বিয়ার রাইট-উইং পলিটিক্যাল এলিমেন্ট সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে। তার জানা তথ্য হলো, কলম্বিয়ার ফ্যাসিস্ট পার্টিকে মোটা টাকা চাঁদা দেন রলফ মুয়েলার। পার্টির ছত্র-ছায়ায় গজিয়ে ওঠা গ্রুপগুলোও তার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। তিরিশের দশকে মাথাচাড়া দেয় পার্টিটা, আজও সেটার অস্তিত্ব টিকে আছে।'

'তার তথ্যের উৎস কি?' জানতে চাইলো রানা।

'তার ভাই ফ্যাসিস্ট পার্টির একজন সদস্য, রানা। সমাজে তার পরিচিতি ও সুনাম আছে, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, পশু-পাখির প্রতি দরদ আছে। অথচ কি যেন একটা নেই তার মধ্যে, কিসের যেন একটা অভাব।

'ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে, এ-ধরনের অভাব নিজেদের মধ্যে তৈরি করি আমরা। বরং না থাকাটাই খারাপ, একটা প্যাটার্ন পাবার ভয় থাকে।'

'দয়ামায়াহীন, নির্দয়-নিষ্ঠুর, অশুভ শক্তির কথা বলছো তুমি।'

সবিনয়ে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ইফ ইউ উইল।'

'আমি বলছি শুধু নিরেট ঘটনার কথা। হিটলারের অনুপস্থিতিতে নাৎসী পার্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন মুয়েলার, এই লোক তাতেই খুশি। তার কথা হলো, যুদ্ধের পর এ-দেশে সমস্ত ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের উৎস বা প্রেরণা ছিলেন মুয়েলার। ষাট দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত!'

'তারপর কি ঘটলো ?'

'হঠাৎ সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়,' বললেন আলিজান আকরাম। 'পার্টিকে আর চাঁদা দেন না মুয়েলার। তবে ইতিমধ্যে অবশ্য গোটা দেশেই নিজস্ব গতি পেয়ে গেছে লা ভায়োলেনশিয়া। যে বিশৃংখল পরিস্থিতি ফ্যাসিজমের বিকাশে সার হিসেবে কাজ করে, সেটা যথেষ্টই পাওয়া গেল। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এ-ধরনের অবনতি আবার দেখা দিলো ক'বছর আগে, ড্রাগ ব্যবসায়ীরা যখন জঙ্গলের বন্য আইন নতুন করে চালু করলো।'

'তারপর জন্ম নিলো হোয়াইট গামা।'

'হ্যাঁ,' বৃদ্ধ বললেন। 'মুয়েলার যেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ আত্মীয়দের মধ্যে উইল করে দিলেন। হোয়াইট গামাকে গড়ে তোলা হলো ফরাসী ফ্যাসিস্ট পার্টির আদলে। তাদের ইউনিফর্ম ফরাসী গেস্টাপোর সাথে মিলে যায়। ফরাসী গেস্টাপোর সশস্ত্র সদস্যরা কাঁধের ওপর কালো ব্যাজ লাগায়, এরা লাগায় সাদা কাপড়ে তৈরি গামার প্রতীক।'

'লজেনের বাবা গেস্টাপোর হয়ে কাজ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললো রানা। 'রেজিস্ট্যান্স সদস্যদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে ওদেরকে সাহায্য করে সে।'

'ওই সময় রাজনীতিতে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন মুয়েলার,' বললেন আলিজান আকরাম। 'বাইরে তাঁকে খুব কমই দেখা গেছে। ব্যাপারটা আমি ভালোভাবে চেক করে দেখেছি। ষাট দশকের শুরু থেকে খুব কম লোকই তাঁকে দেখেছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছিলো তিনি যেন নিভৃতে, শান্তিতে মরার জন্যে সব কিছু ছেড়েছুড়ে অবসর নিয়েছেন।'

'মেলে না,' বললো রানা। 'তাঁর সে চরিত্রই নয়।'

'ঠিক বলেছো,' রানার সাথে একমত হলেন আলিজান আকরাম। 'পরে তাঁর সম্পর্কে আরেকটা তথ্য পাই আমি, আর ওটাই তাঁর সম্পর্কে আমার পাওয়া শেষ তথ্য।'

'কি সেটা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো রানা।

'মুয়েলার একজন ওফিওলজিস্ট।'

'তারমানে তিনি পড়াশোনা করেছেন···।'

'সাপ সম্পর্কে, রানা,' বললেন আলিজান আকরাম। 'সাপ পোষা তাঁর একটা বিশেষ শখ। সে সময় একাধিক চিড়িয়াখানায় বিষাক্ত সাপের চাহিদা মেটান তিনি। সবগুলোই দুর্লভ প্রজাতির। তাঁর এই শখটা নতুন করে মাথাচাড়া দেয় ষাট দশকের শুরুতে, অবসর নেয়ার পর। এ-থেকে তুমি কোনো প্যাটার্ন পাচ্ছো কি?'

'কই, না,' মাথা নেড়ে বললো রানা।

'ষাটের দশকের শুরুটা ছিলো দক্ষিণ আমেরিকার নাৎসী ফেরারি-দের জন্যে আতংকজনক,' আলিজান আকরাম বললেন। 'কারণ ওই সময়ই ইসরায়েলিদের হাতে ধরা পড়ে আইখম্যান।'

'আপনি বলতে চাইছেন, ইসরায়েলিদের হাতে ধরা পড়ার ভয়েই অবসর নেন মুয়েলার?'

'হ্যাঁ,' বৃদ্ধ বললেন। 'অবশ্য তাঁর জানার কথা ছিলো না যে রাজ-নৈতিক কারণে নাৎসী ফেরারি ধরার অভিযান প্রায় বাদ দেবে ইস-রায়েলিরা।'

'তাই অবসর নিয়ে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিলেন মুয়েলার,' বললো রানা, হঠাৎ উৎসাহ বোধ করলো ও। 'আপনি জানেন না, পানামায় আমি সারভাইভাল ট্রেনিং নিয়েছি। এলাকাটা কলম্বিয়ার মতোই। জলা-

ভূমি, নদী হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাহাড়ী নালা, পোকামাকড়। আর সাপ।'

মৃদু হাসলেন আলিজান আকরাম। 'মনে হচ্ছে, আরো একটা প্যাটার্ন পেয়েছি আমরা, রানা।'

'আপনাকে কে বললো, মুয়েলার একজন ওফিওলজিস্ট?'

'আরেকজন ওফিওলজিস্ট,' বললেন আলিজান আকরাম।

'আপনার কি মনে হয়,' জানতে চাইলো রানা, 'দুর্লভ প্রজাতির সাপ, যেগুলো মুয়েলার সরবরাহ করেছেন, সে-সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলতে রাজি হবে লোকটা?'

'সাপ বিশেষজ্ঞরা ভারি অদ্ভুত লোক, রানা। সত্যি কথা বলতে কি, সাপ বাদে অন্য কোনো বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহই নেই।'

ট্যুরিস্ট রুট এল রেতিরো-র কাছাকাছি একটা স্নেক ফার্মে এলো রানা। জীবনে এই প্রথম একজন সর্প বিশেষজ্ঞের সাথে হাত মেলালো ও। ফার্মের সাপগুলো সাধারণ দর্শকদেরও দেখানো হয়। বিষ নিয়ে ব্যবসা করে, এমন লোকদেরও আসা-যাওয়া আছে। প্রচুর সাপ রয়েছে এখানে, বিশেষ করে দুর্লভ প্রজাতির সাপ দেখার জন্যেই লোকজন ভিড় করে।

কারমান আভারো খুবই রোগা, মনে হলো সামান্য ধাক্কা দিলে পড়ে যাবে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, প্রতি মুহূর্তে চঞ্চল দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজছে, সম্ভবত বিষাক্ত সাপই হবে।

'মি. রানা অনেক দূর দেশ থেকে এসেছেন,' আনুষ্ঠানিক পরিচয় ও কুশলাদি বিনিময়ের পর সর্প বিশেষজ্ঞ কারমান আভারোকে বললেন আলিজান আকরাম। 'ওঁর জানামতে স্থানীয় প্রজাতিগুলোই হলো

একমাত্র বিপজ্জনক সরীসৃপ, যেগুলো বিশাল সব সরকারী কমপ্লেক্সে আস্তানা গেড়েছে।'

'উনি কোন্ দেশের নাগরিক?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো কারমান আভারো।

'বাংলাদেশ ও আমেরিকার।'

'দুঃখিত। আমি বাংলাদেশী বা আমেরিকান নমুনা কখনো দেখিনি,' শুকনো গলায় জবাব দিলো সর্প বিশেষজ্ঞ।

'ভারি বিষাক্ত ওগুলো,' বললো রানা। 'খাঁচায় ভরে রাখা দরকার।'

'এখানে সাপ আমরা খাঁচায় ভরি না, মিঃ রানা। আর সব প্রাণীদের মতো ছোট্ট জায়গায় রাখলে, অসুস্থ হয়ে পড়ে সাপ, সতেজ থাকে না। রেখে দেখেছি। কিছু কিছু মারা যায়, বাকিগুলো এতো ভয় পায় যে সারাক্ষণ নিজেদের লুকোবার জন্যে ব্যস্ত থাকে। ট্যুরিস্টরাও ব্যাপারটা পছন্দ করে না।'

বিকল্প কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, স্নেক পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ্য করলো রানা। লন বা জলাশয়ে যাবার পথে সরীসৃপদের জন্যে কোনো বাধা নেই। পরিখার চারপাশে একটা মাত্র উঁচু পাঁচিল ওগুলোকে আটকে রেখেছে। ভিজিটর বা দর্শকদের পথটা সযত্নলালিত লনের ওপর দিয়ে চলে গেছে, পথটা কয়েক শ্রেণীর মারাত্মক প্রজাতির সাপের নাগালের মধ্যে পড়ে।

'দুলর্ভ জিনিসের প্রতি আগ্রহ রয়েছে মিঃ রানার,' বললেন আলিজান আকরাম। 'এক ভদ্রলোক আপনাদের এখানে দুর্লভ সাপ সরবরাহ করেছেন, সেগুলো সম্পর্ক জানতে পারলে খুশি হবেন উনি। ভদ্রলোকের নাম সিনর মুয়েলার।'

'তারমানে আপনারা জারারাকা সম্পর্কে জানতে চান।'

'তাহলে তাই।'

হঠাৎ করে রোগা-পটকা কারমান আভারোর শরীরে যেন শক্তির বান ডাকলো। প্রায় লাফিয়ে উঠলো সে, উৎসাহে আরো চকচকে হয়ে উঠলো চোখ জোড়া। 'জারারাকা দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় সাপ। বিষ তো আছেই। এই প্রজাতির চল্লিশটা নমুনা আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, উপ-প্রজাতির সংখ্যাও প্রায় চল্লিশ। জারারাকা মানে হলো বল্লমের মাথা। বর্ণনাটা হুবহু মিলে যায়, এই প্রজাতির সাপের মাথা ওরকমই দেখতে।'

একটা ঘাস ঢাকা পরিখার সামনে থামলো ওরা, নিচে শুয়ে রয়েছে অলস একটা সাপ, অর্ধেক শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে। বর্শা আকৃতির মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত চার ফুটের মতো লম্বা। ধূসর সবুজ আর কালো গায়ে হলুদ চেইন-এর মতো দাগ। 'আপনারা একটা জারারাকা দেখছেন,' বললো কারমান আভারো।

এ-ধরনের প্রাণী যাদের পছন্দ, এটাকে তার সুন্দর বলেই মনে হবে, ভাবলো রানা।

'এটার শরীর আর মাথা অন্য প্রজাতির সাপের চেয়ে একটু বেশি মোটা। খুব দ্রুতগতি নয়, তবে হিংস্র। ফণাটাও খুব বড়, বিষও প্রচুর।'

'এটা কি ওই ভদ্রলোক সাপ্লাই দিয়েছেন, সিনর মুয়েলার?' প্রশ্ন করলো রানা।

'এটা ছিলো তাঁর পাঠানো শেষ সাপ,' বিষণ্ণ সুরে বললো আভারো। 'প্রায় দু'বছর হলো সিনর মুয়েলারের কাছ থেকে আর কোনো সাপ আমি পাইনি। এটা যদি মারা যায়, আমার কাছে আর কোনো নমুনা থাকবে না।'

'কেন তিনি সাপ পাঠানো বন্ধ করলেন?'

'কি জানি,' আবার দুর্বল হয়ে পড়ার সাথে সাথে আকারেও যেন ছোটো হয়ে গেল আভারো। 'কয়েকছর ধরে বিভিন্ন প্রজাতির নমুনা সাপ্লাই পাবার পর সিনর মুয়েলারকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম, তাঁর এই আবিষ্কারের একটা নাম তিনি দিতে পারেন কিনা। উত্তরে তিনি লিখলেন, ওটাকে সিটাডেলিস বলে ডাকা যেতে পারে। বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস। সাও পাউলো-র ইন্সটিটিউটে আবেদন জানালাম, তারা যেন নমুনাটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। সাথে সাথেই তা দিলো ওরা। তাঁর সাফল্যের খবরটা চিঠি লিখে জানালাম, কিন্তু সিনর মুয়েলার উত্তরে যা বললেন, মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার।'

'কেন?'

'তাঁর জবাব পড়ে মনে হলো, তাঁকে সম্মানিত করায় তিনি বেজার হয়েছেন। সেই থেকে তিনি আর আমাকে কোনো নমুনা পাঠান না।'

ফেরারি একজন লোকের আচরণ এরকমই হবার কথা, ভাবলো রানা। এমন একটা শখ তিনি ধরে রাখতে পারেন না, যেটা তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে। রানার মনে পড়লো, নাৎসী অভিধানে সিটাডেল শব্দটার গুরুত্ব আছে। যুদ্ধের শেষ দিকে, বার্লিনে, রাইখ চ্যান্সেলারির নিচে অনেকগুলো বাংকারের সমষ্টিকে সিটাডেল বলা হতো। 'সিটাডেলিস এতো দুর্লভ কেন?' জানতে চাইলো ও।

'কখন একটা জিনিসকে দুর্লভ বলা হয়? ওটার মতো আর খুব কমই আছে, তাই। বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস-এর গঠন, রঙ আর আকৃতি আলাদা, তার কাজিনদের সাথে মেলে না। কাছাকাছি

অন্য প্রজাতির চেয়ে ওটার বিষও অনেক বেশি মারাত্মক।'

'কামড়ালেই মানুষ মারা যায়?'

'যদি না সাথে সাথে অ্যান্টিডোট দেয়া হয়,' কারমান আভারো বললো। 'এমনকি সদ্যোজাত সিটাডেলিসের বিষও মারাত্মক। বিষটা রেড ব্লাড সেলের দেয়াল ধ্বংস করে দেয়। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যায় ভিকটিম।'

দাগ কাটা সাপটার প্রতি ভয় মেশানো শ্রদ্ধা দ্রুত বেড়ে গেল রানার। 'বিশেষ করে এই প্রজাতির সাপের কামড় খেয়ে বাঁচার জন্যে অ্যান্টিডোট সেরাম কি কিনতে পাওয়া যায়, সিনর আভারো?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'তা কেন পাওয়া যাবে না,' খুশি হয়ে উঠলো আভারো। 'তবে দাম খুব বেশি পড়বে।'

'যে-কোনো ফি দিতে রাজি আছি আমি,' বললো রানা, 'এই সাপটাকে যদি তার আদি ও আসল ঠিকানায় দেখতে পাই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কারমান আভারো বললো, 'সেরাম সংগ্রহের চেয়ে সেটা অনেক কঠিন হবে, মিঃ রানা।'

'কেন, সাপটা কোত্থেকে এসেছে সেটা তো আপনার জানার কথা।'

'তা শুধু একা সিনর মুয়েলার জানেন,' বললো আভারো। 'আমি স্রেফ আন্দাজ করতে পারি।'

'প্লিজ।'

'আমি জানি সাপটা পাঠানো হয়েছে লেটিসিয়া থেকে, তবে লেটিসিয়া থেকে আরো অনেক জিনিস আসে যেগুলো লেটিসিয়ায় পাঠানো হয় অন্য কোথাও থেকে,' বলে থামলো আভারো, ড্রাগ চোরাচালান সম্পর্কে বলার সময় আর সব কলম্বিয়ানরা যেমন থামে। 'শিপমেন্ট-

গুলোয় কোনো ক্রিসমাস স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওগুলো অন্য কোনো দেশ থেকে পাঠানো হয়নি। লেটিসিয়া ট্রাপিজিয়ামকে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে ব্রাজিল আর পেরু। আমাজন-এর দিকে কলম্বিয়ার একটা জানালা ছাড়া কিছু নয় ওটা।'

'আপনি বলতে চাইছেন তিনটের যে-কোনো একটা দেশ থেকে আসতে পারে সিনর মুয়েলারের সাপটা।'

'ব্যাপারটা সেরকমই মনে হয়,' বলে কি যেন চিন্তা করলো আভারো। 'তবে আমার ধারণা, সীমানাটা রিয়ো কাকুয়েটার চেয়ে বেশি উত্তরে হবে না, কারণ এই প্রজাতির সাপ বিষুব রেখা ছাড়িয়ে খুব বেশিদুর যায়নি। দক্ষিণ সীমানা হিসেবে আমি রিয়ো নাপো আর রিয়ো আমাজন পর্যন্ত যাবো, তার বেশি নয়। ওই সীমানার নিচের এলাকাগুলোয় অন্য আরেক প্রজাতির সাপ রয়েছে, মাসুরানা। জারারাকুকুদের যম ওগুলো, নিজেদের এলাকায় প্রায় নির্বংশ করে ফেলেছে।'

যথেষ্ট সাহায্য করলো কারমান আভারো। জঙ্গলটা কয়েকশো মাইল ছোটো হয়ে এলো রানার জন্যে। 'আপনি কি আর কিছু বলতে পারেন আমাকে, সিনর আভারো?'

'আপনি যদি জারারাকুকু ধরতে চান, আপনাকে আমি অত্যন্ত সাবধান হতে বলবো,' বললো আভারো, সাপ সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে তার।

# দশ

হেলিকপ্টার দেয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন কর্নেল বেনিন, কিন্তু রানার হাতে গর্ডন উইন্টারকে ছেড়ে দিতে ঘোর আপত্তি জানালেন। মিনিস্টারের অফিস থেকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। লজেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার দেয়া হুমকিটাকে ভয় পাচ্ছে সরকার—বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে কার্টেল নাকি তার ঘোষিত সরকার বিরোধী হরতাল পালন শুরু করবে। কাজেই উইন্টারকে এমন কোথাও যেতে দেয়া চলে না যেখান থেকে তার পালিয়ে যাবার আশংকা আছে। সেরকম কিছু ঘটলে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

তবে বেনিন এমন একজন মানুষ, যিনি তাঁর ঋণ শোধ করতে চান। লজেন প্রসেসিং ল্যাবে হানা দিয়ে ও লজেনকে গ্রেফতার করে গোটা কলম্বিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় কর্নেল হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর পদোন্নতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। রাজনীতিতেও তাঁর একটা মর্যাদাপূর্ণ আসন নিশ্চিত হতে যাচ্ছে, বিশেষ করে দেশের প্রধান দুটো দলই যখন তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের আপত্তিটা খণ্ডন করা হলো, এরপর আর কর্নেলের সহযোগিতা পেতে রানার

কোনো অসুবিধে হলো না। তিনি এমনকি লেটিসিয়া ডি. এ. এস. প্রধানকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটা চিঠিও দিলেন রানাকে, তাতে তাকে নির্দেশ দেয়া হলো রানার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্যে।

আলিজান আকরামকে সাথে নিয়ে সর্প বিশেষজ্ঞর সাথে কথা বলার চব্বিশ ঘণ্টা পর, মেডিলিনের হাসপাতাল থেকে উইন্টারকে মুক্ত করে একটা সামরিক আকাশযানে চড়ে বোগোটার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রানা। ওখানে পৌঁছে একটা বেল ২০৫ পেলো ও, চেহারা দেখে মনে হলো কোনো তেলখনি থেকে সদ্য ফেরত এসেছে ওটা। হেলিকপ্টারটার বৈশিষ্ট্য হলো, গায়ে কোনো সামরিক চিহ্ন নেই। আগেরটার মতো অত শব্দও করে না।

তবে সামান্য খুঁতখুঁতে ভাব থেকেই গেল রানার মনে। এবার অতিরিক্ত কোনো পাইলট থাকছে না। লেফটেন্যান্ট নাসাউকে অন্য একটা অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয়েছে, প্রয়োজনের সময় অন্য কোনো পাইলটও পাওয়া গেল না। কর্নেল বেনিনকে রানা বোঝালো, তাঁর চিন্তার কিছু নেই, কারণ নিজেও একজন দক্ষ পাইলট ও। কর্নেল প্রশ্নটা না তুললেও, রানা নিজে জানে যে, হাত ও মাথার ব্যথা পুরোপুরি না সারায় হেলিকপ্টার চালাতে সমস্যা হবে ওর। কিন্তু কি আর করা।

ব্যাক-আপ পাইলট নেই, এটা উইন্টারের জন্যে কোনো উদ্বেগের ব্যাপার তো নয়ই, বরং খুশির খবর। তার ধারণা, সে বাদে অন্য কেউ চালালে হেলিকপ্টারটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে বাধ্য। বোগোটা ছাড়ার খানিক পর পাইলটের সীটে বসার জন্যে রীতিমতো কড়া ধমক দিয়ে কন্ট্রোল থেকে তাকে সরাতে হলো রানার।

পাথরের মতো নিচের দিকে খসে পড়লো ওরা। এ-ধরনের হেলি-

কপ্টার আগে খুব একটা চালায়নি রানা, অনেকদিন পর হাতে পড়ায় যা শিখেছিল তা-ও প্রায় ভুলে গেছে, তাছাড়া এটা ফিক্সড-উইং এয়ারক্রাফটও নয়। মাত্র দেড় সেকেণ্ডের মধ্যে অনুশোচনায়, বিব্রত-বোধে ও ভয়ে আকুল হতে হলো ওকে।

শুধু খসে পড়লো না, বিরতিহীন ডিগবাজি খেতে শুরু করলো হেলিকপ্টার। কন্ট্রোল-এর চারটে সিস্টেমের যে-কোনো একটার সাহায্য নিয়ে যখনই পরিস্থিতি সামাল দিতে গেল, ফলাফল হলো তাৎক্ষণিক ও আগের চেয়ে মারাত্মক। সিকলিক-এ কোনো পরিবর্তন আনতে হলে একইসাথে অন্যান্য আরো অনেক বোতাম টিপতে হবে, তারপর অ্যাডজাস্ট করতে হবে রাডার পেডাল। থ্রটলের সাথে সমন্বয় ঘটাতে হবে লিফট-এর, লিফটের সাথে থ্রাস্ট-এর, থ্রাস্টের সাথে ইঅ্য-র, ইঅ্যর সাথে ঈশ্বরের। অনেক ভুল-ভাল করলো রানা, তার ওপর আচ্ছন্ন একটা ভাব গ্রাস করে রাখলো ওকে।

কোনো সাহায্য না করে উইন্টার শুধু তারস্বরে চিৎকার করলো। রানার ফ্লাইট স্যুটের ভেতর সচল হলো ঘামের অনেকগুলো ধারা। তারই সাথে পাল্লা দিয়ে উইন্টারের চিৎকার অর্থাৎ সশব্দ হাসি বাড়তে লাগলো। কন্ট্রোল ফিরিয়ে নিতে রাজি নয় সে। দেখতে পাচ্ছে একটা সবুজ ঘাস ঢাকা মাঠে পতন ঘটতে যাচ্ছে ওদের, বিরাট বৃত্ত রচনা করে নেমে যাচ্ছে চপার, কিন্তু ভুলেও কন্ট্রোলের দিকে একবার হাত বাড়ালো না। বাধ্য হয়ে অনুরোধ করতে হলো রানাকে।

'আই টেক ওভার,' সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে বললো উইন্টার।

শেষ পর্যন্ত ওরা বিধ্বস্ত হলো না।

'সত্যি কথা বলতে কি, আপনি আমাকে মুগ্ধ করেছেন, জেনারেল,' গম্ভীর সুরে বললো উইন্টার।

তার দিকে তাকালো না রানা।

নিচে গরু ছাগল চরছে, তাদের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে ছুটছে চপার। 'এটা ফিক্সড-উইং টাইপ হলে আরো দ্রুত পড়তো,' বললো উইন্টার। 'দেখে যা বুঝলাম, দু'পাঁচ ঘণ্টা সময় দেয়া হলে ভালো পাইলটদের তালিকায় নাম লেখাতে পারবেন আপনি। আপনার হাত আর চোখের কোঅর্ডিনেশন চমৎকার। তবে ফুট কোঅর্ডিনেশনে কিছুটা গলদ আছে।'

নিরাপদ আকাশে অর্থাৎ ওপরদিকে দ্রুত উঠে যাচ্ছে চপার। 'এবার আমাকে বলবেন, কোথায় আমরা যাচ্ছি?' জানতে চাইলো উইন্টার।

'দিকটা তোমাকে আগেই জানিয়েছি,' বললো রানা।

'তাই কি?' চপারের নাক নিচের দিকে তাক করলো উইন্টার, স্পীড হঠাৎ করে বেড়ে গেল। হঠাৎ করেই বললো সে, 'ওভার টু ইউ।'

কন্ট্রোল হাতে পেয়ে প্রথমেই মাথা ঠাণ্ডা রাখলো রানা। আগের মতোই ডিগবাজি খেতে শুরু করলো চপার, কিন্তু এবার তাড়াহুড়ো না করায় সংশ্লিষ্ট বোতামগুলোয় ঠিকমতোই চাপ দিতে পারলো ও। সিধে হলো ওদের আকাশযান।

'আপনি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলেন,' অভিযোগের সুরে বললো উইন্টার। 'দু'পাঁচ ঘণ্টা নয়, মাত্র দু'পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে শিখে নিলেন!'

সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে কথা বললো রানা, 'আমরা লেটিসিয়ায় যাচ্ছি।'

'হুঁহুঁ, হেডিং আর ফুয়েল লোড দেখে আগেই আন্দাজ করে-ছিলাম,' বললো উইন্টার। 'কেন বলবেন?'

'আমরা মুয়েলারকে ধরতে যাচ্ছি।'

'মাটি দেয়ার অনুষ্ঠানে দেখা সেই বুড়ো ভদ্রলোককে ?'

'হ্যাঁ।'

'বুড়ো একজন মানুষকে ধরার জন্যে এতো সব আয়োজন, ঠিক যেন মিলছে না,' বললো উইন্টার। 'তবে ইনি সম্ভবত বিশেষ শ্রেণীতে পড়েন।'

'তা বলতে পারো।'

'কে উনি ?'

'অ্যাডলফ হিটলার।'

হেসে উঠলো উইন্টার। 'করুন, ঠাট্টা করুন।'

'খুব একটা ভুল বলিনি। শোনো, তোমাকে দিয়ে আমি কয়েকটা কাজ করাতে চাই।'

'বান্দা হাজির, জেনারেল।'

'আকাশে আমরা তিন ঘণ্টা থাকবো, তাই না ?'

'কমবেশি।'

'যতোটা সম্ভব কাছাকাছি যেতে চাই আমি,' বললো রানা।

'চপার নিয়ে খুব কাছাকাছি যাওয়ার মানে কি, আপনি ভালোই বোঝেন। আপনার দ্বারা কতোটুকু সম্ভব আমি জানি না।'

'লেটিসিয়ায় পৌঁছে, আমি চাই, মুয়েলার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে তুমি। ওখানে তোমার অনেক লোকের সাথে যোগাযোগ আছে, তাই না ? আমাদের জানতে হবে ঠিক কোথায় আছেন তিনি।'

'কাজটা করবো, কারণ আমি আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছি।'

'কাজটা তুমি করবে, কারণ না করলে অনেক বছর জেল খাটতে হবে তোমাকে।'

'স্বভাবতই এবার তাহলে আমার পরিণতি ... প্রশ্নটা ওঠে,' তাড়া-

তাড়ি বললো উইন্টার।

'লেটিসিয়ায় তোমার সাফল্যের ওপর নির্ভর করবে ব্যাপারটা। জোরালো লাথি খেয়ে হয়তো অনেক দূরে ছিটকে পড়বে তুমি, আমার চোখের আড়ালে।'

'আপনি কি আমার মুক্তির কথা বলছেন?'

'ঠিক ধরেছো,' বললো রানা, যদিও গর্ডন উইন্টার সম্পর্কে নিশ্চিত-ভাবে এখনো কিছু জানে না ও। তাকে ছেড়ে দিলেও কি সে নির্বি-বাদে চলে যাবে? বা চলে গিয়ে কার্টেলের সাথে আবার হাত মেলাবে না?

—

হাইল্যাণ্ড ছেড়ে সমতল প্রান্তরের ওপর চলে এলো ওরা। সবুজ আর খয়েরি সমতল প্রান্তর যেন দূর অসীমে মিলিয়ে গেছে। পাম গাছের সাথে জলাশয়গুলো পরিষ্কার চেনা গেল হেলিকপ্টার থেকে, খানিক পর পর খুদে স্ট্যাম্পের মতো দেখালো খামারগুলোকে। কয়েক জায়গায় গরু-ছাগলের বড়সড় পাল দেখা গেল।

কয়েকবারই কন্ট্রোল হাতে নিলো রানা, প্রতিবার আগের চেয়ে ভালো চালালো হেলিকপ্টার। কোথাও ভুল হলে শুধরে দিলো উইন্টার।

সান হোসে দে গুয়েভার ছোট একটা শহর, শহরের বাইরে সরু একটা স্ট্রিপে নামলো ওরা ফুয়েল নেয়ার জন্যে। আকাশে ওঠার খানিক পর নিচে শুরু হলো জঙ্গল, সেই দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

আরো সামনে নিচু মেঘ দেখা গেল। ঝড়-বৃষ্টির আশংকা করলো উইন্টার।

জঙ্গলের ভেতর জনবসতির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। রূপালি

একটা লেক দেখলো ওরা, এরকম আরো আছে বলে আন্দাজ করলো রানা. লেকের কিনারায় বা আশপাশে এতো বেশি গাছ যে নিচে দৃষ্টি চলে না. পায়ে হাঁটা সরু পথ বা ঘর-বাড়ি যদি থাকেও, নজরে পড়লো না।

নদীগুলোও দেখতে পেলো ওরা, তাও এতো সরু যে পলকের জন্যে চোখে পড়লো। কয়েকটা নদীর নাম বলতে পারলো উইন্টার—ভপেস, আপাপোরিস, মিরিটিপারনা। তারপর ওরা চলে এলো সবচেয়ে বড় নদীটার ওপর। অনেক চওড়া বলেই গাছপালার ফাঁকে দেখা গেল ওটাকে। নদীর নাম কাকুয়েটা।

কারমান আভারো যে সীমানাগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছে, কাকুয়েটার অপর তীর তার একটা। এখান থেকে শুরু হলো সাপের রাজত্ব। সভ্যতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। নদীটা ছাড়া আর কোনো সূত্র দেয়নি আভারো। এ-ধরনের জঙ্গলে যদি কোনো লোক লুকিয়ে থাকে, আর সে যদি পানির উৎসগুলো এড়িয়ে যায়, অন্যান্য সূত্র ছাড়া তাকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

সাথে করে উইন্টারকে নিয়ে আসার সেটাই কারণ রানার। প্রয়োজনীয় তথ্য একমাত্র সে-ই দিতে পারে ওকে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, লোকটা সাহায্য করলে তাকে মুক্তি দেবে ও। এসপিওনাজ জগতের দস্তুরই এই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়, অনেক সময় ক্ষমা করতে হয় শত্রুকে। কর্নেল বেনিন ব্যাপারটা বুঝবেন। এডওয়ার্ড বার্ন বুঝবে না।

রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার এই সুযোগটা ছাড়বে না সে।

তিন ঘণ্টা পর রিয়ো পুটমাইও পেরোলো ওরা, নামতে শুরু করলো

লেটিসিয়া ট্রাপিজিয়ামের দিকে। জায়গাটাকে মাটির একটা বড় পা বলা যেতে পারে, আমাজনের ওপর দখল কায়েম করার সুযোগ দিয়েছে কলম্বিয়াকে। আমাজন অববাহিকায় রাবারের চাষ যখন খুব ভালো হচ্ছে, পেরুর সাথে এই জায়গাটার দখল নিয়ে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় কলম্বিয়ার। প্রতিযোগিতা আর সিনথেটিক-এর আগমন ঘটায় রাবার ব্যবসা প্রচণ্ড মার খেলো, তবু কলম্বিয়া সরকার পেরুকে জায়গাটা ফেরত দিলো না। তার বদলে ওটাকে স্মাগলারদের স্বর্গ হিসেবে গড়ে তোলা হলো।

'লেটিসিয়ায় সম্ভাব্য সব আপনি পাবেন,' বললো উইন্টার। 'অরিজিনাল পিকাসো চান? অটোমেটিক রাইফেল? হীরা, চুনি, পান্না? কিংবা জাগুয়ারের চামড়া দরকার? অথবা জ্যান্ত একটা জাগুয়ার? রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্রেফ অর্ডার দিতে হবে আপনাকে, জেনারেল। তারপর হোটেলে অপেক্ষা করুন। খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না, অর্ডারের জিনিস আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।'

'কোকাও,' বললো রানা।

'কোকাও, অবশ্যই,' বললো উইন্টার। 'শহরটার মধ্যে দিয়ে টন টন কোকা পাচার হয়। আমাজনের আশপাশে রয়েছে হাজার হাজার খাদ আর নদী। যে-কোনো জায়গায় পৌঁছে দেবে আপনাকে।'

'কিনবো আমরা,' বললো রানা, 'তবে কোকা নয়। তুমি চারপাশে প্রচার করে দাও যে আমরা সিটাডেলিস খুঁজছি। আমাদের পরিচয়, আমরা প্রাণীবিজ্ঞানী। বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস খুব দরকার আমাদের। মনে থাকবে তো নামটা?'

মাথা নাড়লো উইন্টার। 'না।'

'লিখে দিই।'

'তাতে কোনো লাভ হবে না,' বললো উইন্টার। 'সাপের প্রতি আমার অদ্ভুত একটা ঘৃণা আছে। ফলে সাপ সংক্রান্ত যে-কোনো তথ্য মনে গেঁথে নিতে পারি না। এ-ব্যাপারে আমাকে আপনি মানসিক-প্রতিবন্ধী বলতে পারেন।'

'তোমার ভুলে গেলে চলবে না যে তোমাকে আমার সাথে আসতে বাধ্য করা হয়েছে, মিঃ গুসানো।'

'আপনি তাহলে এই নামে ডাকবেন আমাকে?'

'তোমার পাসপোর্টের নাম,' বললো রানা। 'জুয়ান গুসানো, জাতীয়তা ব্রাজিলিয়ান।'

'আমার,' বললো উইন্টার, 'পাসপোর্ট?'

'ঠিক।'

'আমি আপনার হুকুম মানতে বাধ্য, জেনারেল।'

'নামটা ভুলো না তাহলে,' বললো রানা।

'না।'

আমাজন নদীর ওপর চলে এলো হেলিকপ্টার। ফুলেফেঁপে থাকা বিশাল একটা নদী, তবে উৎস থেকে অনেক দূরে চলে আসায় আকারে ওটা ছোটো হবে বলেই ধারণা করলো রানা। ধারণাটা মিথ্যে প্রমাণ হলো। পুর্টো নারিনো-র কাছে নদীটাকে প্রথম দেখেছিল, দু'মাইল চওড়া, তীর থেকে খানিক দূরে একটা দ্বীপ ছিলো। পানির গতিবেগও ছিলো তীব্র। পাঁচশো ফুট উঁচু থেকেও ফুলেফেঁপে ওঠা বান অনুভব করতে পেরেছে ও, ঠিক পালস অনুভব করার মতো। বিপুল জলরাশির এই উচ্ছ্বাস ও বান শতো শতো মাইল দূরের পাহাড়গুলোকে ছুঁয়ে এগিয়ে গেছে, প্রভাবিত করছে সামনের হাজার হাজার মাইল এলাকা।

ঠিক কোকার মতো। আন্দেজের পুব ঢালে, পেরুভিয়ান প্রদেশে, যেখানে আমাজন জন্ম নিয়েছে, সে-জায়গাটাও গভীর জঙ্গলে ঢাকা, সেই জঙ্গলে প্রচুর কোকা পাতা জন্মায়। আমাজন আর তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় রওনা হয়ে যায় কোকেন। ড্রাগ-এর সাথে আসে প্রকৃতির অন্য আরেকটা আবর্জনা, স্মাগলার।

কাজেই লেটিসিয়া এয়ারপোর্ট স্রেফ একটা স্ট্রিপ নয়, পুরোদস্তুর সার্ভিস টার্মিনাল। প্রতিদিন অনেকগুলো কমার্শিয়াল ফ্লাইট রয়েছে, দেশের অভ্যন্তরে আসা-যাওয়া করছে। দুনিয়ার অন্য কোনো ছোটো শহরের এয়ারপোর্টে এতো বেশি প্লেন পার্ক করা অবস্থায় দেখেনি রানা। দামী বা নতুন নয় একটাও, তবে সব ক'টা উড়তে পারে। বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদে চকচক করছে ওগুলোর গা।

সী-লেভেলে তাপমাত্রা বিষুবীয় এলাকার মতোই। শুধু গরম নয়, ভ্যাপসা একটা গন্ধের সাথে ওদেরকে আক্রমণ করলো রাজ্যের মাছি আর পোকা। শূকরগুলো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা যেন ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ায় এসে পড়েছে। তবে দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় ঠিক আমাজনের মতো পানিপথ নেই। নদীর রঙ খয়েরি, কুয়াশা উঠছে পানি থেকে, ক্ষিপ্রগতি স্রোতে এমন একটা আত্মবিশ্বাসী ভাব, আমাজন যেন জানে যে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। লম্বা পা নিয়ে সাদা এক ঝাঁক পাখি দ্বীপ লক্ষ্য করে উড়ে যাচ্ছে। বাঁক ঘুরে এগোলো একটা হাইড্রোফয়েল। এমন কিছু দেখলো না রানা যার ভেতর বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে।

লেটিসিয়া শহরটাও রানার মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারলো না। শহরটা নদীর করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি তিনশো ফুট উঁচু বাঁধ থাকায়। বাকি তিন দিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বনভূমিকে,

জঙ্গলের কিনারায় সাদা রঙের বাড়ি-ঘর দেখা গেল। তেমন কোনো নির্মাণ কৌশল চোখে পড়লো না, দৃষ্টি কাড়তে পারে এমন কোনো দালানও নেই শহরে। সভ্যতা যেন এখানে শুরু হতে গিয়েও হয়নি।

লেটিসিয়া দোকানের শহর। ফ্রি পোর্টটা আসলে অন্য কোথাও যাবার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। নদীর কিনারায় সার সার বোট হাউস, সবগুলোর ভেতরে আধুনিক সী-প্লেন দেখা গেল। তীর ঘেঁষে নোঙর ফেলেছে সব ধরনের জলযান, হাইপাওয়ারড বোট থেকে শুরু করে বড়সড় ক্রুজার-ও আছে।

উইন্টারের প্রিয় একটা হোটেলে উঠলো ওরা। আলাদা আলাদা বাংলো, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বিল হবে মার্কিন ডলারে। ডি. এ. এস. এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করার কথা একবার ভাবলো বটে রানা, তবে সিদ্ধান্ত নিলো তার দরকার নেই। উইন্টারের সাহায্য নিয়ে যা করার একাই করবে ও। অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবার আশংকা।

'লেটিসিয়া শহরের নিজস্ব একটা ইউনিফর্ম আছে,' বললো উইন্টার। 'সেটা না পরলে ক্ষতি নেই, তবে পরলে লাভ আছে। সুন্দর একটা লেদার ব্যাগ কাঁধে ঝোলাতে হবে, আর পরতে হবে লেস লাগানো সাদা শার্ট।'

'ডিলার সাজার দরকার কি আমাদের?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমরা তো প্রাণীবিজ্ঞানী।'

'ওরা যেন সে-কথা বিশ্বাস করবে!' এমন সুরে বললো উইন্টার, যেন ওর কণ্ঠস্বরই লেটিসিয়ার সবচেয়ে শুকনো জিনিস। 'বিশেষ করে ভিক্টর ধরাশায়ী হবার পর। দু'জন সন্দেহজনক বিদেশী নানা প্রশ্ন নিয়ে চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। আমাদের শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে কেউ যদি বুল'স আই সেঁটে দেয়, টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্যে, একটুও

অবাক হবো না আমি। গায়ে ইউনিফর্ম না থাকলেও ওরা পড়তে পারবে, আমাদের কপালে লেখা রয়েছে ডি. ই. এ.।'

'রাস্তায় তো কাউকে সশস্ত্র বলে মনে হলো না,' বললো রানা। 'দু'একজনের সাথে হ্যাণ্ডগান থাকলেও থাকতে পারে, বড়জোর। তবে, তুমি যদি মুয়েলার সম্পর্কে কিছু সংগ্রহ করতে পারো, যেমন খুশি সাজতে আমার আপত্তি নেই।'

'এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিলাম, জেনারেল,' বললো উইন্টার। 'ওভার টু মি, রাইট?'

'ওভার টু ইউ।'

তবে মুহূর্তের জন্যেও উইন্টারকে চোখের আড়াল করলো না রানা। হোটেল বারে এক ল্যাটিন দম্পতির সাথে কথা বললো উইন্টার, একই জায়গায় কথা বললো অপর এক লোকের সাথে। লোকটা ইউরোপিয়ানের মতোই দেখতে, কাঁধে ঝুলছে একটা স্নেকস্কিন ব্যাগ। গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে। উইন্টারকে চেনে বলেই মনে হলো, দেখা হওয়ায় বিস্মিত বা আতংকিত হয়নি। শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নেয়ার আগে উইন্টারের সাথে বিশ মিনিট কথা বললো সে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে নদীর কিনারায় চলে এলো উইন্টার, তার পঞ্চাশ গজের বেশি কাছে এলো না রানা। একটা বোটে চড়লো উইন্টার, মাথার কাছে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। তার চেয়ে দ্বিগুণ আকৃতির এক লোক এগিয়ে এলো। শুয়েই থাকলো উইন্টার। মিনিট দশেক কথা বললো ওরা। বোট থেকে নেমে দুই এঞ্জিনবিশিষ্ট আরেকটা বোটে চড়লো উইন্টার, গোলগাল আরেক লোকের সাথে আলাপ শুরু করলো।

সারাক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে থাকলো রানা। বন্ধু আর বোট নিয়ে উই-

ণ্টার যদি পালাতে চেষ্টা করে, ওদেরকে ধরতে কতোক্ষণ সময় লাগবে ওর ? আরেকটা বোট যদি পাওয়াও যায়, ধাওয়া করে লাভ হবে কি ? নদীতে তীব্র স্রোত রয়েছে, ঢেউগুলো শক্তিশালী, স্রোতের সাথে ভেসে যাচ্ছে বিরাট আকারের আবর্জনা—গাছ, ঘাসসহ মাটির চাপড়া ইত্যাদি। ধাওয়া করে লাভ না হলেও, রানা জানে এসআইজি-২০১ দিয়ে দু'জনের একজনকে ফেলে দিতে পারবে ও।

রানা যে তা করবে বা করতে পারে, গুসানোর তা জানা আছে। অন্তত রানার দৃষ্টিসীমার ভেতর থেকে কিছুতেই পালাবার চেষ্টা করবে না সে। আয়োজন হয়তো এখনি করে রাখছে, পরে কেটে পড়বে। প্রশ্ন হলো, কতো পরে ?

পালিয়ে কোথায় যাবে উইন্টার ? কার্টেলের কাছে ফিরে গিয়ে লাভ নেই, জানে সে। কারণ কার্টেল এখন আর বিশ্বাস করবে না তাকে। অন্তত আগের মতো তো নয়ই। ডি. এ. এস.-এর জন্যে যা করেছে সে, কার্টেল যদি জেনে ফেলে থাকে, দেখামাত্র তারা খুন করবে ওকে।

এ-সব কথা ভেবেই ঝুঁকিটা নিয়েছে রানা। পনেরো মিনিট পর দেখা গেল, ভুল করেনি রানা। বোট থেকে নেমে হাতছানি দিয়ে রানাকে ডাকলো উইন্টার। তার সাথের লোকটাও দাঁড়ালো, ঘুরে তাকালো রানার দিকে।

দূর থেকে যতোটুকু মনে হয়েছিল তারচেয়ে খাটো লোকটা, তবে শরীরটা আরো পেশীবহুল।

তার বোটটাও শক্তিশালী। দুটো ইয়ামাহা এঞ্জিনে চলে। বোটের নাম অ্যাগারেব। 'ক্যাপটেন কোসিমো ইলিয়ভিচ,' পরিচয় করিয়ে দিলো উইন্টার।

বাড়ানো হাতটা ধরলো রানা। দুই বাহুতে উল্কি আঁকা রয়েছে—একটায় নোঙর, অপরটায় হরতন। মুঠোর ভেতরও জিনিস দুটোর কোনো অভাব নেই।

'আমেরিকান, অ্যাঁ?' লোকটার উচ্চারণে কোনো ঘৃণা প্রকাশ পেলো না। 'ব্রিজপোর্ট, কানেকটিকাট-এ বহুদিন ছিলাম আমি, যুগোশ্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে আসার পর। তারপর এখানে চলে আসি। জায়গাটা আমার জন্যে মন্দ নয়।' হাসলো সে।

রানাও সামান্য হাসলো। 'আপনি তাহলে জাগরেব থেকে এসে-ছেন?'

'লেটিসিয়া থেকে,' বললো কোসিমো ইলিয়ভিচ। 'এই নদী আমার বাড়ি।'

'আশপাশের সবাইকে চেনে ও। তাই না, কোসিমো?' জিজ্ঞেস করলো উইন্টার। 'সে এমনকি আপনার জার্মান বন্ধুকেও চেনে।'

'তার নাম মুয়েলার,' বললো রানা। 'বুড়ো একজন মানুষ, মাথায় টাক। ঠোঁট নেই বললেই চলে।'

'সত্যি অদ্ভুত,' বললো ক্যাপটেন কোসিমো, 'ওই ঠোঁট দুটো। ওগুলো থেকে কথা বেরোয় না। হয়তো কথা কিভাবে বলতে হয় তা-ই জানে না।'

কিংবা হয়তো এমন কিছু বলার নেই যা মানবজাতি হজম করতে পারবে। এরইমধ্যে কোসিমোর কাছ থেকে সুসংবাদ পেয়েছে রানা, তাই কোনো মন্তব্য না করে ইতস্তত করলো, লোকটাকে ভয় পাও-য়াতে চায় না। তারপর বললো, 'আপনি আমার মস্ত উপকার কর-বেন, ক্যাপটেন, যদি জানাতে পারেন সিনর মুয়েলারকে কোথায় পাবো আমি।'

'মস্ত মানে কি ?' সরাসরি জানতে চাইলো কোসিমো। 'পাঁচ হাজার ডলার ?'

'না,' মাথা নাড়লো রানা।

'তাহলে কি তিন হাজার ডলার ?'

কথা না বলে আবার মাথা নাড়লো রানা। মনে মনে জানে, মুয়েলারের খোঁজ পাবার বিনিময়ে কয়েক লাখ ডলার দিতে হলেও বেশি দেয়া হবে না।

'তাহলে দুই হাজার ডলার,' প্রশ্ন নয়, সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো কোসিমো।

'হতে পারে,' বললো রানা।

'শুনুন, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে তা আমি আপনাকে জানাতে পারবো না,' বললো কোসিমো, হৃৎপিণ্ড আঁকা হাতটা দিয়ে দাড়িতে আঙুল চালালো। 'তিনি বা তাঁর বোট যেখানে আছে, আমি কখনো যাইনি সেখানে। আমি শুধু বলতে পারি, কোথায় খুঁজতে হবে। খাদের উজানে, পারানা-য়, কালো প্রিস্টকে আপনি দেখেছেন তো ?'

'কালো পুরোহিত ?'

'উসতাচি,' মুচকি হেসে বললো কোসিমো, হাসিটার সাথে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর বেমানান ঠেকলো। 'আপনি উসতাচি সম্পর্কে জানেন না, পরদেশী ?'

মাথা নাড়লো রানা।

'ওরা খুব ভালো ক্যাথলিক,' সেই মুচকি হাসির সাথে বললো কোসিমো। 'ওরা চায় সবাই তাদের মতো ভালো ক্যাথলিক হোক। পারে না। বেশিরভাগই অর্থোডক্স, কাজেই উসতাচিদের কাজের অন্ত নেই। ইহুদিদের ধরে ধরে ক্যাম্পে ভরেছিল নাৎসীরা, তাই না ? কিন্তু

একজন সার্বকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, প্রভু হিসেবে কাদের চায় সে, একজন উসতাচিকে না একজন নাৎসীকে? যতোবার প্রশ্নটা করবেন, বারবার একই উত্তর পাবেন আপনি—প্রভু হিসেবে জার্মানদের চাই।'

'কেন?' জানতে চাইলো রানা।

'নাৎসীরা তাদেরকে খুন করেছে, কিন্তু উসতাচিরা তাদের আত্মা চায়। মানুষের আত্মা কয়েকবারে বের করে আনে ওরা, টুকরো টুকরো করে, একসময় কাঁচা মাংস ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, ওটা-কেই বলা হয়—গুড ক্যাথলিক ম্যান।'

'সার্বরা তাদের কথা না শুনলেই তো পারে।'

'সার্বরা শুধু মরতে জানে, তারা কোনো কাজের নয়। রোমে যিনি বসে আছেন, পোপ, তাঁর জন্যে ব্যাপারটা মন্দ হয়নি। কারণ তিনি শুধু ভালো ক্যাথলিক চান, তা না পেলে সার্বদের লাশ চান। ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরেকটা ক্রুসেডের মতো।'

রানা কিছু বললো না, কারণ জানে কোসিমোর কথা বেশিরভাগই সত্যি। ডেথ ক্যাম্পগুলোয় এতো বেশি ইহুদি মারা গেছে যে ছোটো-খাটো জেনোসাইডের দিকে কারো নজরই পড়েনি। যুদ্ধের পর ইহু-দিরা মারতে শুরু করলো ফিলিস্তিনীদের, উপমহাদেশ বিভক্ত হবার পর পাকিস্তান আর ভারতে মারা পড়লো হিন্দু আর মুসলমানরা, যুগোশ্লাভিয়ায় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেকার যুদ্ধে মারা পড়লো হাজার হাজার লোক—খোঁজ নিলে জানা যাবে, প্রতিটি দাঙ্গার জন্যে দায়ী ছিলো উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা। বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও, উসতাচিরাই সবখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াচ্ছে। 'কালো যে পুরোহিতের কথা আপনি বলছেন, তিনি কি যুদ্ধের সময় জার্মানদের পক্ষে কাজ করেছেন?'

'অবশ্যই,' বললো কোসিমো। 'তখন কাজ করেছেন, এখনো করছেন—যদি মারা গিয়ে না থাকেন।'

'তিনি কি মুয়েলারের পক্ষে কাজ করেন?'

মাথা নাড়লো কোসিমো। 'আপনি ভালো করে আমার কথা শুনছেন না। বোটটা আমি দেখেছি, যেটার মালিক আপনার এই মুয়েলার ভদ্রলোক। পারানা নদী ছাড়িয়ে সেই যে খাদটা, সেদিকে যেতে দেখেছি, বুঝলেন? বোটে পুরোহিত ছিলেন। ...ড্রাগোনোভিচকে আমি নিজের হাতেই খুন করতাম, কিন্তু ভাবলাম আমার হয়ে কাজটা জঙ্গলই তো করতে পারে। জঙ্গল বরং আরো ধীরেসুস্থে মারবে তাঁকে। তিনি যেমন সার্বদের মারেন।'

'আমি জানতে চাই, ঠিক কোথায় বাস করেন পুরোহিত,' বললো রানা। 'তথ্যটার জন্যে দু'হাজার ডলার দেয়া যেতে পারে।'

'টাকাটা আমি নেবো,' উদারভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললো কোসিমো। 'কিন্তু যদি পুরোহিত মশাইকে আপনি খুন করতে পারেন, প্রতিটি ডলার ফেরত পাবেন। শুধু যে টাকা ফেরত পাবেন তাই নয়, আপনি আমার শ্রদ্ধাও পাবেন, কারণ তাঁর মতো একজন লোককে খুন করতে পারা পুণ্যের কাজ।'

# এগারো

ভোরের আবহাওয়ায় স্বেচ্ছাচারিতার ভাব। মাটিতে তুমুল বৃষ্টি, ফোঁটা-গুলো খাড়াভাবে পড়ছে। আকাশে ভরামাস পোয়াতির মতো জল-ভরা মেঘ আড়ষ্ট মন্থরগতিতে মিছিল করছে সেই ট্রাপিজিয়াম পর্যন্ত। কোর্স ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল উইন্টার। এয়ারস্পীড কখনো কমাতে হলো, কখনো বাড়াতে হলো। রানা নিশ্চিত, অন্তত একবার পেরুর আকাশসীমা লংঘন করেছে ওরা। সভ্য জগতে হিসেবের এই সামান্য ভুল গুলি ছুঁড়ে আকাশযানকে ভূপাতিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে কোথায় সভ্যতা? মাঝে-মধ্যে ফাঁক পাওয়া গেলে মেঘের নিচে জঙ্গল ছাড়া তেমন আর কিছু রানার চোখে পড়লো না। পুট-মাইওতে পৌঁছুবার পর খানিকটা পরিষ্কার হলো আবহাওয়া, নিচে জঙ্গল আর চওড়া একটা নদী দেখতে পেলো ও। কলম্বিয়ানরা পুট-মাইও নদীতে গান-বোট রাখে, এলাকাটায় বহুকাল ধরে রাবার চাষও করা হয়, তবু জনবসতির স্পষ্ট কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না। নদী থেকে দূরে একেবারেই কিছু নেই।

নদীকে পিছনে রেখে উত্তর-পশ্চিমে যাচ্ছে চপার। আবার মেঘের বড় একটা মিছিলের ওপর চলে এলো ওরা, পাঁচ মাইল লম্বা সেটা। পরে যখন নিচটা দেখা গেল, দেখেই নদীটাকে চিনতে পারলো উইণ্টার। 'পারানা রিভার,' বললো সে।

পারানা একটা শাখা নদী, সরু আর ধীরগতি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ধূসর সাপের মতোই এগিয়েছে, গাছের ফাঁকে কখনো দেখা যায়, কখনো যায় না। আঁকাবাঁকা পথ ধরে সেটাকে অনুসরণ করলো উইণ্টার। খুব নিচু দিয়ে উড়ছে ওরা, মনে হলো উঁচু পামগাছ-গুলো মুখে বাড়ি মারবে। উজানের দিকে সাড়ে সাত কিলোমিটার এগিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল উইণ্টার, গাঢ় রঙের পানি সহ একটা খাদকে অনুসরণ করলো। গাছপালায় ঢাকা, খাদটা কতোটুকু লম্বা বোঝা গেল না। দু'মিনিটেরও কম সময়ে ম্লান খানিকটা বালির ওপর স্থির হলো হেলিকপ্টার, মন্থরগতি পানিপথ এখানটায় সবচেয়ে চওড়া বলে মনে হলো রানার।

'কোসিমোর যদি ভুল না হয়,' বললো উইণ্টার, 'টার্গেট থেকে তিন হাজার মিটার দূরে রয়েছি আমরা।'

'বালির ওপর নামতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

পাইলট হিসেবে তার যোগ্যতাকে সন্দেহ করা হয়, এমন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না উইণ্টার। বালির ছোট্ট বিস্তৃতির ওপর নিখুঁত-ভাবে হেলিকপ্টার নামালো সে। সুইচ অফ না করা পর্যন্ত রানা টেরই পেলো না যে ল্যাণ্ড করেছে ওরা।

জোয়ারের সময় উঠে আসতে পারে পানি, তাই দুই তীরের গাছের সাথে চপারটাকে বাঁধলো ওরা। পাঁচ মিনিটের মাথায় ইনফ্লেইটেব্‌ল্ কেভলার র‍্যাফট্ নিয়ে রওনা হয়ে গেল, দু'জনেই ছোটো বৈঠা

চালাচ্ছে। স্থির হয়ে আছে বাতাস, বুনো ফুল আর পচা লতাপাতার গন্ধ ঢুকলো নাকে। কোথাও কোথাও মাথার ওপর জড়াজড়ি করে আছে গাছের শাখা-প্রশাখা। ভেলার সাথে সাথে আসছে পোকার ঝাঁক, মশাগুলো সুযোগ পেলেই কামড়াচ্ছে।

ছায়া, গভীর ছায়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না রানার। তবে জানে, এদিকের পানিতে পিরানা আর ক্যানডারিস মাছ প্রচুর পাওয়া যায়, দুটোই মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একটা মানুষের শরীর থেকে সমস্ত মাংস ছাড়িয়ে নিতে পারে। রক্তের গন্ধ পেলেই পাগল হয়ে ওঠে পিরানা। ক্যানডারিস পাগল হয় প্রস্রাবের গন্ধে। বেগ চেপে রাখতে না পারলে সাবধানী একজন লোকের উচিত কাজ হবে তার অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো পানি থেকে যতোটা সম্ভব দূরে রাখা এবং আশা করা যে বোটের পলিমেরাইজড আবরণ বিজ্ঞাপনের দাবি অনুযায়ী সত্যিই যথেষ্ট মজবুত।

ওদের কোনো সমস্যা হলো না, এমনকি কালো পুরোহিতের ক্যাম্প ঠিক জায়গায় না পাওয়া সত্ত্বেও। উজান বেয়ে আধ মাইলটাক যাবার পরই কিছু চিহ্ন দেখা গেল, এই প্রথম বোঝা গেল আশপাশে মানুষ আছে। প্রথমে চোখে পড়লো পাড়ের কাছাকাছি পরিষ্কার করা খানিকটা জায়গা, যেন এখানটায় কেউ রাত কাটিয়েছে। তারপর পাওয়া গেল সেদ্ধ মাংস আর প্রস্রাবের গন্ধ। ইংরেজি এস হরফের আকৃতি নিয়ে ঘুরে গেছে পাহাড়ী খাদ বা নালাটা, পুরো বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল ক্যাম্প।

রানা যা ধারণা করেছিল, তারচেয়ে বড় ক্যাম্পটা। গাছ আর ঘাস কেটে প্রায় তিনশো গজ জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। দুটো বড় আর একটা ছোটো কুঁড়েঘর। পাতা দিয়ে তৈরি ঘরগুলোর চাল দেয়াল

ছাড়িয়ে নেমে এসেছে প্রায় মাটি পর্যন্ত, ক্রমশ ঢালু হয়ে। ছোটো ঘরটা গোলাকার, বাকি দুটোকে চৌকোই বলা যায়। রানা ভাবলো, চার্চ হওয়া বিচিত্র নয়।

শেষ ঘরটা থেকে এক লোক বেরিয়ে এলো। পুরোহিত হওয়া অসম্ভব নয়। যীশুর ক্ষত ছাড়া বাকি সবই তার মধ্যে আছে। কালো, হাফ-হাতা শার্টের বাইরে বেরিয়ে থাকা সরু হাত দুটোয় পটাশিয়াম পার-মাঙ্গানেট দিয়ে বেগুনি-লাল নকশা কাটা হয়েছে। থ্যাবড়া, ভোঁতা চেহারা, বেড় দিয়ে রেখেছে সাদা চুল। খোঁড়াচ্ছে লোকটা, আঁকাবাঁকা একটা লাঠি হাতে বেরিয়ে এলো। দুর্বল কণ্ঠে কথা বললো সে, 'ভায়েরা!'

ওরা কি এই লোককেই খুঁজছে? পাড়ে ভেলা ভিড়িয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো রানা। 'শুভেচ্ছা, ফাদার। আপনার সাথে কথা বলার জন্যে অনেক দূর থেকে এসেছি আমরা।'

বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো বুড়ো পুরোহিত। নাকের ডগার কাছে ঝুলে রয়েছে চশমাটা, মুখ উঁচু করে ওদের দিকে তাকালো সে। চেহারায় রাগ রাগ ভাব। ঈশ্বরকে নয়, তাকে খুঁজছে ওরা, এটা যেন তার কাছে একটা দুঃসংবাদ। তবে কথা বললো আগের সেই শান্ত, দুর্বল স্বরে, 'তোমাদের স্বাগত জানাই। খুব একটা মেহমান তো আর পাই না আমরা।'

পুরোহিতের শেষ শব্দটা খানিকটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলো রানাকে। শব্দটা কি কেতাবী, ঈশ্বর আর তাঁর উপাসনালয়কে বোঝাচ্ছে, নাকি ওটা ব্যবহার করা হলো অধিকতর আক্ষরিক অর্থে? শেষ বয়েসে বুড়ো একজন মানুষ জঙ্গলে পালিয়ে এসে বসবাসের জন্যে নিশ্চয়ই এটা বানায়নি। 'আমরা প্রাণীবিজ্ঞানী,' বললো রানা। 'আমার সাথে

রয়েছে কুরান বসানো। আমার কলিগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ আমাজন রিসার্চ-এর বিজ্ঞানী। আর আমি ডক্টর বিল হাওয়ার্ড, মেরিল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটিতে আছি।'

চোখ বন্ধ করে আবার খুললো পুরোহিত। 'আমি ব্রাদার জাসিন্টো।'

এক নিমেষে সব যেন খাপে খাপে মিলে গেল। জাসিন্টো মানে হলো হাইঅ্যাসিন্থ্। ব্রাদার হাইঅ্যাসিন্থ্ নিচু পদের একজন সন্ন্যাসী ছিলো, বিশপ হুডালের তৈরি ভ্যাটিক্যান এস্কেপ রুট-এর একটা অংশবিশেষ ছিলো সে। ইসরায়েলি ইন্টারোগেটর, যারা আইখ্ম্যানকে জেরা করেছে, তাদের দ্বারাই প্রকাশ পেয়েছে হাইঅ্যাসিনথের কীর্তিকলাপ। 'এখানে আমরা এসেছি একটা সাপের খোঁজে,' বললো রানা। 'স্থানীয়, কিন্তু দুর্লভ, সিটাডেলিস।'

চশমার ভেতর ঘন ঘন চোখ মিটমিট করলো বুড়ো, যেন শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। 'আমাদের এই জঙ্গলে বিভিন্ন জাতের বিষধর সাপ আছে, ভাই। এই জায়গাটা পরিষ্কার করার সময় চল্লিশটার ওপর শুধু সিটাডেলিস পেয়েছি আমরা।'

বিস্মিত হলো না, কারণ রানা জানে মায়ের সাথে অনেক বাচ্চা সাপও থাকে। প্রশ্ন হলো, সাপগুলো ধরলো বা মারলো কে? 'সিটাডেলিস খোঁজার কারণ হলো, ওটাকে নমুনা হিসেবে নতুন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিকে নাকি সিটাডেল বলে একটা জায়গা আছে, সাপটা সেখান থেকে এসেছে। পুরো নামটা হলো, ফাদার, বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস। সিটাডেল জায়গাটা কোথায় বলে দিলে আমাদের ভারি উপকার হয়।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ব্রাদার হাইঅ্যাসিন্থ্। 'আপনার বর্ণনা

শুনে মনে হলো, ওটা একটা দুর্গ,' বললো সে। 'এই এলাকায় সে-ধরনের কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।'

'তাহলে জায়গাটায় কে বাস করেন তা বোধহয় আপনি বলতে পারবেন,' বললো রানা। 'ভদ্রলোকের নাম রলফ মুয়েলার। একসময় লোকে তাঁকে গ্রুপেনফুয়েরার হেনেরিক মুলার হিসেবে চিনতো।'

হঠাৎ করে পরিস্থিতিটা যেন পরিষ্কার হয়ে গেল, মাথাটা কাত করে চারদিকে দ্রুত তাকালো হাইঅ্যাসিন্থ, যেন পালাবার পথ খুঁজছে। কোনো পথ না পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো সে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বড় কুঁড়ে ঘরটার দিকে এগোলো। ঘরটার সামনে একটা ক্যাম্প চেয়ার রয়েছে, ধপ্ করে বসে পড়লো সেটায়। রানা আর উইন্টার তার দু'পাশে এসে দাঁড়াতেও কিছু বললো না সে।

গাছের একটা গুঁড়ির ওপর বসলো উইন্টার, ওপরদিকটা সমতল ও মসৃণ, টেবিল হিসেবে কাজ করে। ফাদার হাইঅ্যাসিনথের দিকে তিন ফুট দুর থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো সে, যেন অদ্ভুত একটা বস্তু পরখ করছে। 'ফান্দে পইড়া বগা কান্দে,' জাতীয় কিছু ইংরেজিতে বললো সে।

'আসলে তোমাদের পরিচয় কি ?' জানতে চাইলো বুড়ো।

'সংগ্রাহক, আমরা সংগ্রাহক,' বললো উইন্টার। 'আপনি সংগ্রহ করেন আত্মা আমরা করি দেহ।'

উইন্টারের দিকে নয়, ফাদার হাইঅ্যাসিন্থ রানার দিকে তাকালো। 'এই দেহটার বয়স হয়েছে, জমা হয়েছে অনেক ক্লান্তি। এখন এটা শুধু শান্তি আর বিশ্রাম চায়। অথচ আমি বুঝতে পারছি, আপনি শান্তিকামী মানুষ নন।'

'আপনি কি শান্তিকামী মানুষ, ড্রাগোনোভিচ?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস

করলো রানা। 'উসতাচির কর্নেল ছিলেন আপনি, আমাদের জানা আছে। নাৎসী অপরাধীদের পালিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন।'

'মাটির বুকে ওরা সবচেয়ে ঘৃণ্য আবর্জনা,' ফাদার বিড়বিড় করে উঠলো। 'ইহুদিরা।'

'সবচেয়ে নোংরা আবর্জনা হলেন আপনারা, যারা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সাহায্য করছেন।' বেল্টের খাপ থেকে ছুরিটা বের করলো রানা। 'যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে যেমন যুদ্ধ করা দরকার, তেমনি শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে দরকার রক্তপাত। তবে, আপনাকে একটা সুযোগ দেয়া হবে। আপনি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন, আইন তার নিজের পথে চলবে। আপনি গ্রেফতার হবেন, আপনার বিচার হবে। আর যদি উত্তর না দেন···বুঝতেই পারছেন। এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় পাওয়া যাবে হেনেধিক মুলারকে?'

রানার মুখ লক্ষ্য করে থুথু ছুঁড়লো হাইঅ্যাসিন্থ্। শুকনো একটা শব্দ হলো মাত্র, ব্যর্থ চেষ্টা, থুথু বেরোলো না। বহুলোককে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়েছে এই লোক, শেষ মুহূর্তগুলোয় দুর্ভাগাদের শারীরিক অবস্থা কি রকম হয় তা তার জানা উচিত ছিলো।

পুরোহিতের বাম হাতের পাঁচড়ার ওপর ছুরির ডগাটা সামান্য একটু ঢোকালো রানা। ঝট্ করে ক্ষতের খানিকটা চেঁছে তুলে ফেললো। একচুল নড়লো না বুড়ো। লোকটা সম্ভবত শারীরিক নির্যাতন গ্রাহ্য করছে না। ক্ষতটা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে দেখে খুশি হলো রানা। 'হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হবে আপনার। তারপর গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হবে পানিতে। কোন্ পানিতে, আপনি জানেন।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্রাগোনোভিচকে কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব দেখালো,

তারপর আঁতকে উঠলো সে। 'খাদটা পারানায় ভর্তি।'

'সেরকমই বলা হয়েছে আমাকে। দেখতে চাই শিকার পেলে কি করে ওরা।'

'আ-আপনি এতো নি-নিষ্ঠুর হতে পা-পারেন না!'

'সাধারণ মানুষদের কথা আলাদা, কিন্তু আপনি একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম, কর্নেল,' বললো রানা।

চশমাটা মুখের সাথে চেপে ধরলো হাইঅ্যাসিন্থ, রানার দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকালো। 'আপনি ইহুদি হয়ে আমার মতো নিরীহ বুড়ো এক লোককে…।'

'আমি ইহুদি হলে এতোক্ষণে তুমি মরে বাঁচতে,' বললো রানা। 'সত্যি কথা না বললে আমার হাতেও তুমি মরবে, তবে কষ্ট পেয়ে। যে-কোনো একটা বেছে নাও।'

বেছে নেয়ার আর আছে কি। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড্রাগোনোভিচের আর যাই থাক, শহীদ হবার সুযোগ নেই। কয়েক সেকেণ্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার পর মুখ খুললো সে। মুখ খোলার পর বলতে বাকি রাখলো না কিছুই।

ষাট দশকের প্রথম দিকের ঘটনা। আইখম্যান ধরা পড়ায় নাৎসী ফেরারীরা আতংকে দিকবিদিক ছুটছে। এই সময়ই সিটাডেলটা খুঁজে পায় ক্রুনোসলা ড্রাগোনোভিচ। ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসী ছিলো সে। যুদ্ধের পর ভ্যাটিকানে তার ক্রোয়াটিয়ান বন্ধুরা জেনোয়ার একটা মঠে তাকে লুকিয়ে রাখে। বিনিময়ে, পরবর্তী সময়ে, অনেক ফেরারী নাৎসী অপরাধীকে পালাতে সাহায্য করে সে। তাদের মধ্যে আইখম্যান আর ক্লাউস বারবি-ও ছিলো। ড্রাগোনোভিচের নিজের ভাষায়, দ্বিতীয়

জীবনে পদার্পণ করতে প্রায় দুশো এসএস অফিসারকে সাহায্য করেছে সে, তাদের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট দু'দলই ছিলো। সবাই তারা কমিউনিজম আর কমিউনিস্টদের ঘোর বিরোধী।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, নাৎসী অপরাধীদের অনেকেই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তার কাছে এলো মার্কিন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মাধ্যমে। নিরাপদ জায়গায় পাচার করার জন্যে মাথাপিছু এক হাজার ডলার করে পায় ড্রাগোনোভিচ। নাৎসী অপরাধী ভি. আই. পি. হলে ফি বেড়ে গিয়ে পনেরো শো ডলারে দাঁড়ায়। আমেরিকানরা, যারা বলশেভিককে মানবজাতির পরম শত্রু বলে জ্ঞান করে, তারা তাকে 'গুড ফাদার' বলে ডাকে। মিত্র পক্ষের ক্যাম্পে উসতাচির যে-সব সদস্য সাময়িক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে তাদের যত্নআত্তি করার জন্যেও অনুমতি দেয়া হলো তাকে।

এক সময় ইউরোপের কাজ শেষ হলো, বিশপ হুডালের অনুমতি নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে এলো ড্রাগোনোভিচ। প্রথমে ব্রাজিলে এলো সে, সেখান থেকে কলম্বিয়ায়। দক্ষিণ আমেরিকায় এসে এমন অনেক লোকের সাথে তার দেখা হলো যারা তার অতীত সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। সুন্দর, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো ড্রাগোনোভিচ। যাদেরকে নিরাপদ জীবন পেতে সাহায্য করেছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো তারা।

তাদের মধ্যে একজন হলো আইখম্যান। যদিও আইখম্যানের আসল পরিচয় ড্রাগোনোভিচ তখন জানে না। কেউ চিনতো না আইখম্যানকে। দক্ষিণ আমেরিকায় এতো তাড়াতাড়ি চলে আসে সে, এসেই যেভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করে, তাকে রিফিউজি বলে মনেই হয়নি। প্রকাশ্যে খুব একটা বাইরে না বেরোলেও, একদিন ড্রাগোনো-

ভিচকে খুঁজে বের করলো সে, বিশপ হুডালের ব্যক্তিগত সুপারিশ দেখিয়ে একটা তথ্য চাইলো তার কাছে। জানালো, একটা জেসি-উইট ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে কৌতূহল রয়েছে তার।

কাজটা মুয়েলারের, কাজেই খুশি মনে রাজি হলো ড্রাগোনোভিচ। কলম্বিয়ার দুর্গম এলাকাগুলোয় জেসিউইট আর ফ্রানসিসকানরাই ছিলো প্রথম শ্বেতাঙ্গ, অধপতিত ইণ্ডিয়ান আত্মা উদ্ধারে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো তারা। জঙ্গলের গভীর প্রদেশে অবিশ্বাস্য সব সাং-গঠনিক ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে জেসিউইটরা। সতেরো শো সাতষট্টি সালে স্পেন থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে এলাকাটা এমন-ভাবে সুরক্ষিত করে ওরা, আজও সেখানে অনুপ্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন।

জেসিউইটদের বিশেষ একটা আস্তানা সম্পর্কে আগ্রহ দেখালেন মুয়েলার। রিয়ো পারানার উজানে, জায়গাটার নাম লাস আনিমাস—আত্মা। বড় আকারের সেটলমেণ্টগুলোর একটা ওটা। পরবর্তী সময়ে রাবার ব্যবসায়ীরাও ওখানে বসবাস করে, কিছু কিছু বিল্ডিং মেরামতও করে তারা। চার্চটাকে বানায় কোম্পানী হাউস, বাসস্থানকে রান্নাঘর আর কাঠমিস্ত্রীর দোকান, কনভেণ্টকে ইণ্ডিয়ান মেয়েদের আস্তানা।

একে একে বিপদ নেমে এলো লাস আনিমাসের ওপর। প্রথমে রাবার ব্যবসা মার খেলো। তারপর নদীর গতিপথ বদলে গেল। নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ায় মূল বনভূমির সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো জায়গাটা। আগে যেটা দুর্গম ছিলো, এখন সেটা অগম্য হয়ে পড়লো। লাস আনিমাস দাঁড়িয়ে থাকলো লেকের মাঝখানে। স্বজাতির বিদেহী আত্মারা ওখানে ঘোরাফেরা করছে, ভয়ে তাই ইণ্ডিয়ানরাও ওদিকে যেতে সাহস পায় না।

যাদের কোনো আশ্রয় নেই, দুনিয়া জুড়ে যাদেরকে খোঁজা হচ্ছে, সেই নাৎসীরা ছাড়া আর কারা যাবে ওখানে। প্রথমে তারা মিত্রপক্ষের তাড়া খেয়েছে, তারপর ইহুদিদের। পালাবার সময়, প্রতি মুহূর্তে তারা উপলব্ধি করেছে নির্জনাবাসের গুরুত্ব কতোখানি। লোকচক্ষুর আড়ালে, জঙ্গলের ভেতর, ফ্যাসিস্ট আইনশৃঙ্খলা ও নীতি-আদর্শ ফিরিয়ে আনার জন্যে কাজ করা সম্ভব। লোকজনকে ট্রেনিং দেয়া সম্ভব। সংগ্রহ করা অস্ত্র লুকিয়ে রাখা যায়।

শুরু হলো গোপন আন্দোলন। যারা নেতৃত্ব দিলো তারা সবাই ফাসিজম-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। লোকজন জড়ো করা হলো সিটাডেল-এ, বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ করে তোলা হলো তাদেরকে। হোয়াইট গামার ক্যাডার হিসেবে অ্যাসাইনমেন্ট বুঝে নিলো তারা।

মুয়েলারের চেয়ে ভালো ট্রেনার তারা পাবে কোথায়! কেউ জানে না তাঁর মনে কি আছে, কিংবা জানে না তাঁর প্ল্যানটা আসলে কতোটুকু বাস্তব। তবে কেউ তাঁর নির্দেশ অমান্য করলো না। নিম্নপদস্থ সন্ন্যাসী তো নয়ই।

শুধু লোকজনের সেবা করার জন্যেই এখানে থাকা ব্রাদার হাই-অ্যাসিনথের। তাদের অনেকেই ক্যাথলিক। কতো রকম ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর আসে তারা তার সাথে দেখা করার জন্যে, মুয়েলারের অনুমতি নিয়ে বা কখনো অনুমতি ছাড়া, কারণ ঈশ্বরকে তারা ভয় ও ভক্তি করে। এই বনভূমিতে, এই পরিবেশে, এ-ও বিশ্বাস করা সম্ভব যে তাঁর অস্তিত্ব মিথ্যে আশ্বাস নয়।

'ব্যাটা ফ্যান্টাসিতে ভুগছে, তাই না?'

'হতে পারে।'

ঘরের একটা খুঁটির সাথে বাঁধা হয়েছে ব্রাদার হাইঅ্যাসিনথকে, সেদিকে তাকিয়ে উইন্টার বললো, 'ভেবে দেখুন না। বছরের পর বছর ধরে এই জঙ্গলে থাকলে, একজন মানুষ সুস্থ থাকে কিভাবে? চোখ দুটো লক্ষ্য করেছেন? কিসের যেন একটা ঘোর লেগে আছে।'

'কিন্তু সিটাডেল মিথ্যে নয়,' বললো রানা। 'এতোটাই সত্যি যে এখানে কি ঘটছে বলার চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো বলে মনে করেছে লজেন। কিংবা বলেনি জায়গাটা কোথায়। সেজন্যেই কি তুমি ভয় পাচ্ছো, উইন্টার?'

'সাপ আমি বড় ভয় করি,' শিউরে উঠে বললো উইন্টার। 'জলাও আমার আতংক। লেটিসিয়ায় থাকার সময় যে-সব কথা শুনলাম, আমার স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।'

শহরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা হয়েছে উইন্টারের, তার বেশির-ভাগই রানাকে এখনো বলেনি সে। 'কি কথা, উইন্টার?'

'গুজব,' বললো উইন্টার। 'যেমন—শহরে এতো বেশি কোকেন ঢুকছে যে গত দশ বছরে এই প্রথম ওরা বাজার বসাতে পারছে। এতো বিপুল পরিমাণে কোকেন আসছে অথচ বাজারে তা পড়তে যা দেরি, সাথে সাথে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, এমন কি বলি-ভিয়ানদের কাছেও আপনি পাবেন না। অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'কোকেনের এই অভাব কতোদিন ধরে চলছে?' চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ঠিক জানি না,' বললো উইন্টার। 'কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়। তবে যতোদূর বুঝতে পারছি, বিশ-বাইশ দিন হয়ে এলো। কোকা-ল্যাণ্ডে একমাস মানে চিরকাল।

বিশ-বাইশ দিন? ওই কাছাকাছি সময়েই ভিক্টর লজেনকে যুক্তরাষ্ট্রে

পাঠাবার মার্কিন অনুরোধ নিয়ে কলম্বিয়ায় আসে টমাস কালভিন।
'লেটিসিয়া থেকে কোকেন বেরিয়ে যাচ্ছে কিভাবে, কোন্ পথে?' জানতে চাইলো রানা।

'না, প্লেনে করে নয়,' বললো উইন্টার। 'লেটিসিয়া থেকে টারাপাকা পর্যন্ত রাস্তা আছে।'

'ওটা পুটমাইও নদীতে না?'

'নদীতে শহর না বলে বলা উচিত শহরে নদী, সত্যি যদি জানতে চান।'

'টারাপাকা থেকে বেরোবার মতো রাস্তা কি আছে?'

কাঁধ ঝাঁকালো উইন্টার। 'না বলতেই দেখছি ধরে ফেলেছেন।'

'তারমানে রাস্তা দিয়ে পুটমাইও যাচ্ছে, সেখান থেকে নদীতে,' বললো রানা। 'কিন্তু তারপরও জিনিসটা রাখার জন্যে একটা জায়গা দরকার হবে। কোকেনের পরিমাণ বেশি হলে ওয়্যারহাউসটাকেও বড় হতে হবে। সাবধানের মার নেই ভেবে বুড়ো এক পুরোহিতকে সর্বক্ষণ স্টেশনে রাখাটাও উচিত কাজ হবে। সে তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করলো, অপারেশন-এর ওপরও চোখ রাখলো। আসলে কি ঘটছে, সবটা তাকে না জানালেও চলে।'

'কিংবা আপনি যতোটা ভাবছেন তারচেয়ে অনেক বেশি মূল্য তার,' বললো উইন্টার। 'সে-ই হয়তো পুরনো কনট্যাক্টগুলোকে ফিরিয়ে এনেছে খেলায়।'

'সম্ভব।'

'তারও বেশি,' বললো উইন্টার। 'কাঁধে শোল্ডার ব্যাগ, লোকটার কথা মনে আছে আপনার? কাল রাতে যার সাথে কথা বললাম?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটা পাইলট,' বললো উইন্টার। 'হ্যানস সনেটা। ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় অ্যাঙ্গোলায়। কোম্পানীর হয়ে কাজ করছিল।'

কোম্পানী? দক্ষিণ আমেরিকায় শব্দটার একাধিক অর্থ প্রচলিত। 'তুমি বলতে চাইছো পাইলট লোকটা এজেন্সির হয়ে কাজ করতো?' আরেকটা শব্দ এজেন্সি, একাধিক অর্থ বহন করে—তবে সি. আই. এ.-কেই মূলত বোঝায়।

'দেখুন, আপনি বিশ্বাস না করলে আমার কিছু আসে যায় না। ছোকরাদের হয়ে সত্যি কাজ করতো সে। তাদের ঘরে এখনো হয়তো একটা পা দিয়ে রেখেছে। সনেটা আমাকে কি বলেছিল, শুনবেন?'

'কি বলেছিল?'

'কোস্টারিকার একটা এয়ারস্ট্রিপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন নিয়ে যায় সে। বড়, ভারি চালান। বিশ্বাস করুন, আমি জানি, ঝুঁকি নেয়ার বান্দা সনেটা নয়। কাজটা কখন নিরাপদ, সে বোঝে। আমাকে বললো, ড্রাগ ভর্তি একটা ডিসি-থ্রি সরাসরি হোমস্টেড এয়ারফোর্স বেসে নিয়ে গেছে। মেইন্টেন্যান্স শেড-এর সামনে পার্ক করে প্লেনটা। সামনের গেট দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যায়। ড্রাগস নামালো কে? তার জানা নেই। আমরা জাদু নিয়ে কথা বলছি, জেনারেল। সত্যিকার ভৌতিক কারবার। ওপর মহলের ক্লিয়ার‍্যান্স ছাড়া এ-ধরনের কাজ আপনি একটা সামরিক বিমানবন্দরে করতে পারেন না। ওপরমহল মানে অনেক ওপরমহল। বলুন, কে হতে পারে সে?'

সি. আই. এ. ওপরমহল হিসেবে চিহ্নিত, তাদের মধ্যে এ-ধরনের কাজে যারা জড়িত হতে পারে তার একটা তালিকা আছে রানার

কাছে, লিলির সাথে বসে তৈরি করা। 'তোমার বন্ধু যে সত্যি কথা বলছে, তার প্রমাণ কি?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমাকে বলেছে, এটাই প্রমাণ,' দৃঢ়কণ্ঠে জানালো উইন্টার। 'আমাকে মিথ্যে বলবে না।'

'ঠিক আছে, ধরা যাক সত্যি কথাই বলছে সে। ল্যাংলির স্বার্থ কি?'

'মোটা লেনদেন,' বললো উইন্টার। 'যা শুনেছি তাই বলছি।'

'কি ধরনের লেনদেন?'

'বিগ ক্যালিবার,' বললো উইন্টার। 'গানস, অ্যামুনিশনস। দ্বিতীয় একটা ফ্রন্ট খোলার জন্যে যথেষ্ট বড় চালান।'

'দ্বিতীয় একটা ফ্রন্ট কোথায়?'

'এটা একটা ফিরতি টিকেট, জেনারেল,' বললো উইন্টার। 'কোস্টারিকা, মায়ামি, কোস্টারিকা। ল্যান্ডিং স্ট্রিপটা নিকারাগুয়া সীমান্তের কাছেই। বাকিটা বুঝে নিন।'

সাউদার্ন ফ্রন্ট, ভাবলো রানা। কন্ট্রা যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিন থেকেই নিকারাগুয়া সীমান্তে কোস্টারিকার সাথে লড়াই হচ্ছে। শুরুতে প্রতিরোধ করা হয় এডেন পাসতোরা-র নেতৃত্বে। সানডিনিসটা হাই কমাণ্ড থেকে বিদ্রোহ করে চলে আসে সে। কিছুদিন পর সি. আই. এ.-র সমর্থন হারায়। নিজেদের প্ল্যান সফল করার জন্যে নিজেদের লোককে দায়িত্ব দেয় সি. আই. এ., কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হয়নি। তারপর, ইদানীং, আরো অশুভ একটা শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে তারা।

অবশেষে সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। ববি মুয়েলারের মাধ্যমে কন্ট্রা হাই কমাণ্ডকে কয়েক মিলিয়ন ডলার দান করে ভিক্টর লজেন। আর্মস আর ড্রাগস ডিলার ছিলো ববি মুয়েলার। চুক্তি সম্পাদনের সময় সি. আই. এ.-র প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলো ডেভিড

গোল্ডব্লাট। বোঝাই যায়, লজেনকে তারা নির্বিঘ্নে ড্রাগ পরিবহণের সুযোগ দেয়, বিনিময়ে ফিরতি ফ্লাইটে কন্ট্রাদের জন্যে অস্ত্র বহন করতে হবে। এ-ধরনের চুক্তির অর্থ হলো, ড্রাগ ব্যবসায়ীদের হাতে নিজের দেশের লোককে বিক্রি করে দেয়া। নোংরা একটা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখার জন্যে স্বদেশের সাথে বেঈমানী করছে সি. আই. এ.।

এই সত্যটাই ফাঁস করার চেষ্টা করেছিল লিলিয়ান। তার পিছনে ভাড়াটে খুনিদের লেলিয়ে দেয় সি. আই. এ.। ভাড়াটে খুনি নয়, কার্টেলকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে রানার বিরুদ্ধে। রণকৌশল হিসেবে পাল্টা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয় রানা। অনেক দূর চলে এসেছে ও, বেঁচে আছে এখনো। সামনে আরো পথ বাকি, সেটা পেরোতে পারলেই, ওর আশা, হেনেরিক মুলারকে খুঁজে পাবে। 'উইন্টার, আমি চাই তুমি চপারের কাছে ফিরে যাও,' বললো রানা। 'বোগোটার ডি. এ. এস.-এর সাথে যোগাযোগ করবে। এদিকে আসার পথে লোকজন নিয়ে সতর্ক থাকতে বলবে কর্নেল বেনিনকে।'

ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে গর্ডন উইন্টার জানতে চাইলো, 'আপনি চান আমি একা যাই, জেনারেল?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'আমার ধারণা, দ্বিতীয় কাজটাও তুমি নিখুঁত-ভাবে সারতে পারবে।'

'কি সেটা?'

'নিজেকে গুম করে ফেলা।'

এই প্রথম উইন্টারকে বাক্যহারা হতে দেখলো রানা। দু'তিনবার ঢোক গিলে শুধু বলতে পারলো, 'ওয়েল, থ্যাঙ্কস, জেনারেল।'

'ফাদার না ব্রাদার, তাকেও সাথে করে নিয়ে যাও,' বললো রানা।

'কতো দূরে?'

'তোমার ইচ্ছে।'

'কতো উঁচুতে?'

'তোমার খুশি।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে খক খক করে হাসলো উইন্টার। 'শুনেছি তিন হাজার ফুট ওপর থেকে পানিতে পড়লে, ওদের মধ্যে নাকি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাজন কখনো ড্রেজিং করা হয় না।'

'তোমার সমস্যার কথা আমাকে শুনিয়ো না,' বললো রানা। 'আমার নিজেরই অনেক সমস্যা আছে।'

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে উইন্টার জানতে চাইলো, 'আপনি চান ডি. এ. এস.-কে আমি জায়গাটার কথা বলি?'

'ওদেরকে টার্গেট দেবে এই পজিশন থেকে দুই দশমিক সাত কিলোমিটার পশ্চিমে।'

রাস্তার দিকে তাকালো উইন্টার, ফাঁকা জায়গাটা থেকে বনভূমির ভেতর ঢুকে গেছে। মাথা নাড়লো সে। 'ভেতরে কোথাও সশস্ত্র একটা বাহিনী থাকতে পারে,' বললো সে। 'আপনার একা যাওয়াটা কি উচিত হবে? সাহায্য যেটা আসবে বলে ধারণা করছি আমরা, পৌঁছুতে কতোক্ষণ লাগবে তার কোনো ঠিক নেই, আদৌ পৌঁছুবে কিনা তাও বলা কঠিন। না, আমার মনে হচ্ছে...।'

'চিন্তা করো না,' বললো রানা। 'আমি আসছি ওরা জানে না।'

# বারো

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রথম এক-দেড় মাইল ভালোই এগোলো রানা। মাথার ওপর গাছের ডাল আর লতাপাতা নিশ্ছিদ্র ছাদ তৈরি করেছে, সরাসরি নিচে নামার পথ পায়নি রোদ, শুধু একটা আভা মিহি ফুল-রেণুর মতো ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সম্ভবত আলো কম বলেই মাটিতে প্রাণের চিহ্ন খুব একটা দেখা গেল না। পায়ের তলায় স্পঞ্জের মতো লাগলো মাটি। পচা লতাপাতায় পিচ্ছিল হয়ে আছে চারদিকে, উৎকট দুর্গন্ধে বমি আসে। লাস আনিমাস থেকে তীর্থযাত্রীরা সম্ভবত খুব একটা আসে না এদিকে।

দুর্গন্ধ আর জমাট নিস্তব্ধতা, শুধু এই দুটোকে জোরালোভাবে অনুভব করা যায়। একটা প্রাণীও চোখে পড়লো না রানার---না পাখি, না বানর বা সাপ। তবে কিছু ছাপ লক্ষ্য করলো ও। পথের ওপর পড়ে থাকা বড় একটা গাছের কর্কশ ছালের ওপর বড় একটা বিড়াল তার নখের আঁচড় রেখে গেছে। কিছু প্রাণীর পায়ের দাগও দেখলো, সম্ভবত পেকারি আর টেইপার-এর। পুরনো নদীর কিনারা পর্যন্ত আর কিছু চোখে পড়লো না। নদীটাকে জলাভূমি বলাই ভালো, কোথাও

কোথাও খুব গভীর, জলজ গাছের পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে পানি।

পরবর্তী পাঁচশো গজ অত্যন্ত বাজে। সন্দেহ নেই ঘুরপথ ধরে গেলে এতোটা কষ্ট হতো না, কিন্তু ট্রেইলটা খুঁজে পায়নি রানা। ওর হাঁটু পর্যন্ত উঠে এলো কাদা। ঝাঁক ঝাঁক মশা আর মাছি চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। ধরাশায়ী গাছ টপকালো একের পর এক। কালো পানিতে প্রচুর প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল—বক, কাইম্যান আর একজোড়া স্পূনবিল। সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রথম একটা সাপ দেখতে পেলো ও। বিরাট সাপ, অ্যানাকোনডা। প্রথমে ওটার মাথা দেখতে পেলো, বাকি শরীর থেকে অন্তত তিন ফুট দূরে। শিকারের সন্ধানে ঘুর ঘুর করছে, ফণা তুলছে বাতাসে, তার বাকি অংশ অগভীর পানিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, বাদামি মাটিতে নীল-সবুজ নকশা কাটা গা, বাজুকার মতো মোটা।

নিজের নিরাপত্তার কথা একবারও ভাবলো না রানা, সহজেই পিছিয়ে আসার উপায় আছে ওর। তবে মিনিটখানেক স্থির দাঁড়িয়ে থেকে প্রাণীটার সৌন্দর্য উপভোগ করলো। সময়ের হেরফের হলে তেমন কিছু আসে যায় না, তবে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটলে তা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কথাটা মনে হতেই একটা ঝাঁকি খেলো রানা, মনোযোগী হলো নিজের কাজে—জলাভূমি ধরে আবার এগোলো। আকস্মিক বৃষ্টিটাকে পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করলো ও।

বৃষ্টি তো নয়, যেন জলপ্রপাতের মোটা ধারা। খানিক আগে থেকে শুরু হলে অপর তীরে হয়তো পৌঁছুনোই হতো না। পিঠে ঝুলছে ব্যাগটা, সেটার ভেতর পানি ঢুকতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন হলো ও। হোঁচট খেলো পাড়ের সাথে। একটা বুট হারিয়ে গেল, তবে গ্রাহ্য

করলো না ও। হন হন করে হেঁটে আধা শুকনো মাটিতে উঠে এলো, সেখান থেকে চলে এলো জঙ্গলের ভেতর। মাথার ওপর আবার পাওয়া গেল ডাল আর লতাপাতার ছাদ।

ওর পথ থেকে ষাট ফুট দূরে রয়েছে ট্রেইলটা। পিছন দিকে তাকিয়ে জলাভূমির ওপর সরু একটা বাঁধ দেখতে পেলো ও, প্রকৃতির তৈরি, ওটার ওপর দিয়েই এদিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে ট্রেইল। ওটার ছু'পাশে জলজ উদ্ভিদ এতো উঁচু হয়ে আছে যে ডান বা বামে দাঁড়ালে পাঁচ ফুট দূরে থেকেও দেখা যাবে না।

ভাগ্যকে দোষ দিয়ে নষ্ট করার মতো সময় রানার নেই। দশ মিনি-টের মধ্যে বনভূমির মেঝেতে পৌঁছে যাবে বৃষ্টির পানি। তাছাড়া, লাস আনিমাসের প্রাচীন জনবসতি এখনো অনেকটা দূরে।

জলাভূমির এদিকটায় গাছগুলো আরো কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ছালগুলো মসৃণ, ডগা আরো ওপর দিকে উঠেছে। কিছু গাছ রয়েছে জীবনে কখনো দেখেনি বা নাম শোনেনি রানা। সুন্দর লাগলেও, কোনো ফুল ছিঁড়লো না, ওগুলো বিষাক্ত হতে পারে। এদিকের জঙ্গলে সঙ্গী আছে, একা নয় রানা—নিরাকার নিস্তব্ধতাকে হটিয়ে দিয়ে জেঁকে বসেছে বৃষ্টি।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিরাপদ সীমানা ছাড়িয়ে যাবার কোনো ইচ্ছে না থাকলেও, সন্ধ্যের আগে ভালো একটা অবজারভেশন পোস্টে পৌঁছুতে চায় রানা। টার্গেট প্রায় দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এসেছে, এই সময় মাটি শক্ত আর ঢালু দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর। পথের ওপর কিছু আছে, বুঝতেই পারেনি ও। খালি পায়ে, ছুই আঙুলের মাঝখানে, কিসের যেন স্পর্শ পেলো। স্পর্শটা শক্ত আর কঠিন হয়ে উঠছে দেখে বিছ্যুৎ চমকের মতো বুঝতে পারলো, পিয়া-

নোর তার। স্থির হয়ে গেল রানা, পা-টা আর তুললো না। তারটা টপকে এলো সাবধানে।

তারের সাথে কি জড়ানো আছে, সি-ফোর নাকি শটগান, দেখার জন্যে থামলো না রানা। এই মুহূর্তে এমন কিছু করতে রাজি নয় যাতে মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। একমাত্র এই গভীর মনোনিবেশই বাঁচিয়ে রাখতে পারে ওকে।

ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নামলো রানা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, দীর্ঘ পা সহ বিশাল একটা ব্যাঙ যেন। চারদিকটা দেখে নিতে প্রতিবার যথেষ্ট সময় ব্যয় করলো ও। ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শরীর। পিঠে পঞ্চাশ পাউণ্ড বোঝা নিয়ে প্রচুর হেঁটেছে, এখন সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এভাবে খুব বেশিক্ষণ এগোতে পারবে না। জোর করে এগোতে চাইলে ঘন ঘন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।

দু'বার টেরই পায়নি তারের উপস্থিতি। সিধে হয়ে হাঁটছে রানা, সামান্য পিছনে ফেলে এসেছে একটা তার, জানে সামনে অন্তত বিশগজের মধ্যে আর কোনো তার নেই। হঠাৎ পায়ে বাধলো ওটা। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারলেও, তাতে শুধু পা-টা মাটিতে রাখা গেল, নাচের অস্থির ভঙ্গিতে বসে পড়তে হলো ওকে। তখনই চাপ পড়লো তারটায়। বুঝলো, পরবর্তী নিঃশ্বাসের সাথে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে ফাঁদটা, পরবর্তী ঘামের ফোঁটার সাথে। অন্ধের মতো পথ থেকে লাফ দিলো ও, গড়িয়ে দিলো শরীরটা।

ওর কাঁধে ঘষা খেলো অস্ত্রটা। জ্যা মুক্ত হবার শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা। পরিষ্কার কানে বাজলো টংকার। ভেজা শার্টটায় হ্যাঁচকা টান পড়লো। মিসাইলটা ঘ্যাঁচ করে গেঁথে গেল ওর দশ ফুট পিছনের একটা গাছের গায়ে। তীর।

ক্রসবো-অ্যারো। বিশাল এক গাছের চার ফুট উঁচু কাণ্ডে বিঁধেছে, ট্রেইল থেকে তিন ফুটেরও কম দূরে। ধনুকটা যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি, বিয়ার নামে পরিচিত, ক্যামোফ্লেজ-কোটেড, বাঘ-ভাল্লুক মারার জন্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা হাতিয়ার। প্রাণ হরণের জন্যে মাংসের গভীরে প্রবেশ করার দরকার নেই, তীরের ডগায় যদি বিষ মেশানো থাকে। স্থানীয় বিষ কিউরেয়ার, তবে অন্যান্য আরো অনেক বিষ সংগ্রহ করা সম্ভব।

রানার মনে পড়ে গেল, প্রায় একমাস হতে চললো মেডিলিনের হোটেল স্যুইটে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ও। আজও ঠিক তাই ঘটলো। এখনো বেঁচে আছে, সেটা ওর ভাগ্য, শুধু সতর্ক থাকার পুরস্কার নয়। কিন্তু ভাগ্য কি বারবার সাহায্য করবে? তীর না হয়ে, এরপর যদি বিস্ফোরক হয়?

কাজেই অত্যন্ত সাবধানে এগোলো রানা। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে জঙ্গলের মাটিতে এলো, একই সাথে ডাল আর লতাপাতার আবরণ ভেদ করে ওপর থেকেও ঝরতে শুরু করলো। আর একটু পরই অন্ধকার নামবে। রানা জানে, যন্ত্রণাদায়ক ও মন্থরগতি প্রতিযোগিতায় নেমেছে ও, প্রকৃতি ও মানুষের সাথে।

অতিমাত্রায় সতর্ক না হলে দ্বিতীয় ফাঁদটা দেখতেই পেতো না রানা। দৃষ্টিসীমার ভেতর প্রতিটি আকার আকৃতির খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করছে ও। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব ঠিক করে নিচ্ছে, কখনোই সেটা পনেরো ফুটের বেশি নয়। এগোবার সময় শুধু ওই পনেরো ফুটের প্রতি ইঞ্চির ওপর নজর রাখছে। যখন দেখলো গাছ থেকে খানিকটা নেমে শিকড়টা পথের ওপর দিয়ে চলে গেছে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ও, সেটাকে এড়িয়ে যাবার সহজ রাস্তাটা

হাতছানি দিয়ে ডাকলেও সাড়া দিলো না।

লোকজন সরাসরি ওই ঝুলে থাকা শিকড়টার নিচে দিয়ে হেঁটে গেছে, তারাও যেন কিছু সন্দেহ করেছিল। গভীর একটা জঙ্গলের ভেতর অনুকরণ প্রবণ শব্দ ও বস্তুর কোনো অভাব নেই—অনেক পাখি দেখতে হুবহু ঠিক যেন একটা ফুল, পোকাকে মনে হয় পাতা, এমন অনেক সাপ আছে দেখে মনে হবে শিকড়—উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো লোক তা করতে যাবে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, আরেক পথে নিয়ে যেতে চাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোনো কারণ আছে।

পথ ছাড়লো না রানা, ঝুলে থাকা শিকড়টার নিচ দিয়েই এগোলো। খানিকটা এগিয়ে এসে ঘুরলো ও, ট্রেইলের পাশের বিবর্ণ মাটিতে তাকালো। সতর্ক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পাম গাছের পাতা দিয়ে তৈরি ছোট্ট পর্দাটা দেখতে পেলো ও, ট্রেইলের দিকে নব্বুই ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করেছে ওটা। তার খুঁজতে খুঁজতে সাবধানে, একটু একটু করে এগোলো রানা। তার পাওয়া গেল না, তবে মাইনটা পাওয়া গেল। প্রথমে রানা দেখতে পেলো লাল তীর চিহ্নটা। মাইন-টা খুদে একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর বসানো রয়েছে, ছ'ইঞ্চি উঁচু। চিনতে পারলো রানা। ক্লাইমোর। মাইনের ওপর লাল তীর চিহ্ন যে-দিকটা নির্দেশ করছে সেদিকেই বিস্ফোরণ ঘটবে। নির্দেশ করছে ট্রেইলের পাশের সরু জায়গাটা।

শিকড়ের তলা দিয়ে না পেরুলে এতোক্ষণে ছাতু হয়ে যেতো রানা। ভাগ্যগুণে যদি না-ও মরতো, বিস্ফোরণের শব্দটা কাজ করতো অ্যালার্ম হিসেবে, শোনা যেতো অনেকটা দূর থেকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, সেটলমেন্ট থেকে এখন আর খুব বেশি দূরে নেই ও।

ক্লাইমোর ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গজও এগোয়নি রানা, রোদের মাত্রা কমে

আসছে দেখে এই প্রথম ট্রেইল ত্যাগ করলো ও। কিনারার কাছে ঘন হয়ে গেছে জঙ্গল, আলো পাবার জন্যে গাছপালাগুলো বেপরোয়া প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার। শেষ সীমায় বনভূমি আরো ঘন হওয়ার কথা, দেখে মনে হবে দুর্ভেদ্য। একটু পরই কারণটা বোঝা গেল। জঙ্গল ঘন হতে পারেনি ক্যামোফ্লেজ নেট-এর জন্যে। জালগুলো বিশাল, প্রতি এক জোড়া গাছের মাঝখানে ঝুলছে ফাঁকা জায়গাটাকে আলাদা করেছে ওগুলো। আলাদা করেছে লাস আনিমাসের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে।

বড় আকারের চারটে দালান দেখলো রানা। সবগুলো পুরনো। প্রতিটির ভিত আর থাম পাথরের তৈরি। এ-ধরনের পাথর শুধু পাহাড়ী শহরে দেখা যায়। পাঁচিল আর দেয়ালগুলো পাথর আর ইঁট দিয়ে গাঁথা। প্রধান ভবনটা সম্ভবত জেসিউইট চার্চ। বিশাল কাঠামো ওটার, সবগুলো জানালা দরজার সামনে ইঁটের পাঁচিল খাড়া হয়ে আছে। কোনো সন্দেহ নেই, ওটা একটা বুরুজ। সিটাডেল।

চোখে স্কোপ তুললো রানা। ক্যাম্পের প্রতিটি জিনিস চিনতে পারলো—হেঁসেল, শোবার ঘর, কমিউনিকেশন সেণ্টার, সাপ্লাই শেড। তবে সিটাডেলটা কি কাজে ব্যবহার করা হয় বুঝতে পারলো না ও। ওটার ডান দিকে আরো একটা ছোটো দালান রয়েছে, চৌকো। এই দুটো বিল্ডিঙে কেউ আসা-যাওয়া করছে না।

ওগুলোর ভেতর কি কোকেন আছে? পশ্চিম গোলার্ধের অর্ধেক কোকা পেস্ট তাহলে কি রানার নাগালের মধ্যে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে? পেস্ট সহজে নষ্ট হয় না, মনে পড়লো ওর। এক জায়গায় অনেক দিন রাখা যায়। এই আবহাওয়ায় কোকেন ক্রিস্টাল নরম থয়েরি পুডিং-এর মতো হয়ে যাবে। কিন্তু পেস্ট একই রকম থাকবে,

যদি না। আরেকটা কেসই কম্পাউণ্ড-এর সাহায্যে ওটার আয়ু কমানো হয়।

কলাম্বিয়া থেকে বিষ ছড়ানো হচ্ছে, তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে গোটা দুনিয়া। বাংলাদেশও নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। সেই বিষের প্রবাহকে থামিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ আসছে রানার সামনে।

ওকে শুধু মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, শান্ত করতে হবে মনটাকে। গুনে দেখতে হবে সব মিলিয়ে কতোজন আছে ওরা এখানে। হিসেব করে বের করতে হবে সঠিক দূরত্ব। তারপর রাত নামার অপেক্ষায় থাকা। ভাগ্য ভালো হলে আবার বৃষ্টি হবে রাতে। পানির শব্দ আর আড়াল পেলে ভেতরে ঢুকতে সুবিধে হবে রানার। প্রথমে গার্ডদের কাবু করবে ও, একজন একজন করে। তারপর সরাসরি হামলা চালাবে কোকা পাতা বা পেস্টের গুদামে। সবশেষে ধাওয়া করবে হেনেরিক মুলারকে।

সময়ের আগেই সুযোগটা পেয়ে গেল রানা, কিন্তু বুঝতে দেরি করায় হাতছাড়া হয়ে গেল সেটা। বুড়ো একজন মানুষকে দেখতে পেলো ও। সিটাডেলের ভেতরের উঠন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, যাচ্ছে একটা নিশ্ছিদ্র দেয়ালের দিকে। মাথায় স্ট্র হ্যাট, কপালের ওপর নেমে এসেছে। পায়ে স্নীকার। কোমরে ছোট্ট শর্টস, গায়ে ঢিলেঢালা সাদা শার্ট। দেখেও রানা বিশ্বাস করতে পারলো না যে এই লোককে ধরার জন্যেই হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে ও। পরিষ্কার চিনতে পারলো তা নয়, চেনা চেনা লাগলো। কপালটা চওড়া। মুখে মাংস আর চর্বির এতো বেশি আধিক্য যে ঠোঁটের যেন কোনো অস্তিত্বই নেই।

মুলারের একটা ছবি গাঁথা আছে রানার মনে, সেটার সাথে চেহারা-

টা মেলাবার চেষ্টা করছে ও, ঠিক এই সময় অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটলো। মনোযোগ ছুটে গেল ওর। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল বৃদ্ধ। মনে হলো নিরেট পাথর ভেদ করে সিটাডেলের ভেতর ঢুকে গেলেন রলফ মুয়েলার।

# তেরো

রাত নামার পর আরো এক ঘণ্টা বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। তারপর রওনা হলো।

বাড়িগুলো থেকে উঠনে যারা মাঝে-মধ্যে বেরিয়েছে তাদের সংখ্যা আঠারো। জঙ্গলের কিনারা ঘেঁষা পাঁচিলের কাছে পাঁচকোণা একটা কাঠামো পাহারা দিচ্ছে আরো পাঁচজন গার্ড। ভবনগুলোর ভেতর লোক থাকতে পারে। ওর একার তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি হলেও, সমাধানের অযোগ্য কোনো সমস্যা দেখতে পেলো না রানা। সনাক্ত করা না গেলে লাস আনিমাস নিরাপদ আস্তানা হিসেবে আদর্শ। কিন্তু হদিশ পাবার পর সমস্ত সুবিধে আক্রমণকারীর। চারপাশের জঙ্গলে অবাধে বিচরণ করা যায়, আড়াল পাওয়া কোনো সমস্যা নয়, পিছু হটে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়াও সম্ভব।

গার্ডদের মেরে ফেলার কোনো ইচ্ছে নেই রানার, তবে পরিস্থিতি ওকে বাধ্য করতে পারে। ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে লোকগুলো কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না, রানার জন্যে এটা একটা মস্ত সুবিধে।

গার্ডরা কোথায় আছে আগেই দেখে রেখেছে রানা। তাদের এক-জনকে লক্ষ্য করে এগোবার সময় ভারি অস্বস্তিবোধ করলো ও। সামনে কি যেন একটা ঝুলছে। মোটা তার দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, জিনিসটা ঠিক চেনা যাচ্ছে না। অন্ধকারে ঠাহর করা গেল না, মনে হলো একটা মানুষ। চোখে স্কোপ তুলে তাকাবার পর অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল ওর। ঠিক মানুষ বলেও মনে হলো না।

আকৃতিটা মানুষের, কালো একটা মানুষের, সম্ভবত হাতে তৈরি একটা কাকতাড়ুয়া। কিন্তু তাই বা কি করে হয়। জঙ্গলের প্রতিকূল পরিবেশ কাঠামোটার গায়ে দাঁত বসিয়েছে, এখান-সেখান থেকে ঝুলে পড়েছে কিছু কিছু অংশ, জট পাকিয়ে গেছে চুল, পচে গলে খসে পড়েছে নাড়িভুঁড়ি। জিনিসটা যাই হোক না কেন, ওটার সাথে মানুষের মিল আছে।

মাথার ওপর ঝুলে থাকা জিনিসটা সম্পর্কে গার্ড যেন সচেতন নয়। পাহারা দেয়ার সাধারণ নিয়মগুলোও পালন করছে না সে। পরনে জ্যাকেট আর হ্যাট, জঙ্গলের দিকে খানিকটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, অ্যাসল্ট রাইফেলটাকে এমনভাবে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, ওটা যেন বৃষ্টিভেজা দিনে ঘরের বউ। বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ার পর হুঁশ হলো লোকটার, গলায় ছুরির পাঁচ ইঞ্চি ব্লেড। 'গার্ড কখন বদল হয়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

রানার কাদামাখা মুখটা দেখে আঁতকে উঠলো লোকটা, সম্ভবত

মাথার ওপর ঝুলন্ত আকৃতিটার সাথে মিল খুঁজে পেয়েছে। 'আটটায়!' ভাঙা গলায় বললো সে।

তারমানে এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট সময় পাওয়া যাবে, ভাবলো রানা। বাইরে এই মুহূর্তে যারা পাহারায় রয়েছে তাদের সব ক'টাকে কাবু করার জন্যে যথেষ্ট সময়। ছুরি ছেড়ে দিয়ে লোকটার নাকে-মুখে কয়েকটা ঘুসি মারলো ও, শেষটা কপালের পাশে। অজ্ঞান লোকটাকে বাঁধলো, রেখে এলো জঙ্গলের আড়ালে। বাকি থাকলো চারজন।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নিলো রানা। ফাঁকা জায়গাটার কিনারা ধরে একটা চক্কর দিলো, তারপর একজন একজন করে ধরলো ওদেরকে। প্রথম তিনজনের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, কেউই তেমন ধস্তাধস্তি করার সুযোগ পেলো না। নাইলন কর্ড দিয়ে হাত-পা বেঁধে রেখে এলো ঝোপের ভেতর। কিন্তু বাকি একজন টের পেয়ে গেল ওর উপস্থিতি, উজি বি দিয়ে গুলি না করে উপায় থাকলো না রানার। তুমুল বৃষ্টি আর চওড়া পাঁচিলে বাধা পেয়ে গুলির শব্দ অনেকটাই চাপা পড়ে গেল, রানা আশা করলো বাড়িগুলোর ভেতর থেকে শুনতে পায়নি কেউ।

চৌকো ভবনটার সমতল মাথায় রয়েছে গান-প্ল্যাটফর্ম। জঙ্গলের কিনারা থেকে শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া, বেড়া থেকে তিরিশ গজ দূরে ভবনের দেয়াল। বেড়াটা গরু ছাগলকে ঠেকাতে পারবে, তার কাটার যন্ত্র থাকায় রানার জন্যে কোনো বাধা হতে পারলো না। বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে নির্বিঘ্নে বাকি ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে এলো ও, পৌঁছে গেল ভবনটার পিছন দিকে।

কাঠামোটা অদ্ভুত। শুধু ছাদটা সমতল নয়, ভবনের সামনে-পিছনে

চৌকো স্তম্ভ খাড়া হয়ে রয়েছে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানার মনে হলো, থাম বা স্তম্ভগুলো সম্ভবত কোনো এক সময় গ্যালারি বা পোর্টিকোর অবলম্বন হিসেবে কাজ করেছে। ওগুলোর মাথা থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে ভবনের মাথায় নেমে আসে একটা ছাদ, যদিও আজ সেটার আর কোনো অস্তিত্ব নেই, বহুকাল আগে ধসে পড়েছে। তবে স্তম্ভগুলো থেকে, বিশেষ করে বাঁ দিকের তৃতীয়টা থেকে, ভবনের সমতল ছাদ পরিষ্কার দেখা যায়, মাঝখানে মাত্র ছ'-ফুটের মতো দূরত্ব।

একটা স্তম্ভ বেয়ে উঠলো রানা।

দু'জন লোককে দেখলো ও। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তলায় জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে। দু'জনেই যে যার বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, মুখ তুলে তাকালেই জঙ্গলের কিনারা পরিষ্কার দেখতে পাবে। খোলা মাঠের দিকে তাক করা রয়েছে ৫'৫৫ এমএম বেলজিয়ান মিনিমি, এক টুকরো স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তলায় পড়ে রয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল।

গুলি করলে দূর থেকে মাজল ফ্ল্যাশ দেখা যাবে, তাছাড়া আহত না হয়ে লোক দু'জন মারাও যেতে পারে। স্তম্ভের মাথা থেকে লাফ দিলো ও।

কাপড়চোপড় ভিজে যাওয়ায় ওজন বেড়েছে, তার সাথে যোগ হলো বৃষ্টির চাপ, লাফ দেয়ার আগে ছোটার সুযোগ না থাকায় হিসেবে সামান্য ভুল হয়ে গেল রানার। ছাদের বাড়তি কিনারায় খালি পা দিয়ে পড়লো ও, পিছলে গেল, ঘষা খেয়ে ছিঁড়ে গেল হাঁটুর চামড়া। খসে পড়ছে রানা, শেষ মুহূর্তে এক হাতে ছাদের কিনারা ধরে ফেললো। পেণ্ডুলামের মতো দুলতে শুরু করলো ভারি শরীরটা। ভিজে ছাদ থেকে পিছলে নেমে আসছে হাত। প্লাস্টিকের তলা থেকে

লোকগুলো বেরিয়ে এলেই সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। বুটের আঘাতে হাতের আঙুলগুলো থেঁতলে দিলে নিজেই ছাদের কিনারা ছেড়ে দেবে ও।

দু'হাত দিয়ে ছাদের কিনারা ধরে মোচড়ামুচড়ি শুরু করলো রানা। কিনারায় শরীরটা প্রায় তুলে ফেলেছে, এই সময় ছাদে শুয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে একজন ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো।

দু'সারি দাঁতের ফাঁক থেকে ছুরিটা নিয়ে ছুঁড়লো রানা। সরাসরি কপালে লাগলো সেটা। দ্বিতীয় লোকটা মেশিনগান তাক করার সময় না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গেল, নিজেদের লোকজনকে সতর্ক করতে চায়। হাঁ করলো সে, রানার লাথিটা খেলো গলায়, ফলে চিৎকারটা শুরু হতে না হতে থেমে গেল।

জার্মান উচ্চারণ, ধরতে পারলো রানা। হেনেরিক মুলার তাহলে দেশী লোকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন।

কপালে ছুরি খেয়ে প্রথম লোকটা জ্ঞান হারায়নি বটে, তবে রক্ত দেখে ভয়ে এতোটাই আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে যে হাড়ের ভেতর সামান্য ঢুকে যাওয়া ছুরির ডগাটা টেনে বের করতে পারেনি। কপালের পাশে দ্বিতীয় লাথি খেয়ে তার সঙ্গী জ্ঞান হারিয়েছে।

ছুরিটা কপাল থেকে টেনে নিলো রানা, লোকটার গলায় এমনভাবে চেপে ধরলো ব্লেড যাতে নিঃশ্বাস ফেলতে না পারে। 'তোমার নাম কি?' জার্মান ভাষায় জানতে চাইলো ও।

নিজের নাম বললো লোকটা, 'ব্রান্ট।'

'কি কাজ করো?'

'এঞ্জিনিয়ার।'

হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো রানার, কারণ জানে জার্মান সামরিক

বাহিনীর এঞ্জিনিয়ার মানে এক্সপ্লোসিভ টেকনিশিয়ান। ড্রাগোনোভিচের বর্ণনা দেয়া টেনিং সেন্টার তাহলে মিথ্যে নয়। 'এখানে তোমাকে কি কাজের জন্যে আনা হয়েছে ?'

জবাব দিলো না ব্রান্ট। ছুরির ডগাটা গলার চামড়ায় খানিকটা ঢোকালো রানা, বেরোবার সাথে সাথে বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল রক্তের কয়েকটা ফোঁটা। এরপর তাড়াতাড়ি মুখ খুললো ব্রান্ট। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো সে।

সাধারণ ধর্মঘট। বন্দী হবার আগে ও পরে ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে লজেন। বোঝা গেল, প্রোগ্রামটা বাতিল করা হয়নি। বরং নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে। হোয়াইট গামার ট্রেনিং পাওয়া ক্যাডারদের দিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাবার প্ল্যান করেছেন রলফ মুয়েলার। মুক্তিপণ হিসেবে লজেনকে ফেরত চাইবেন ?

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলো ব্রান্ট। 'খুব তাড়াতাড়ি পাল্টা আঘাত হানা হবে।'

এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে আরো অনেক তথ্য জেনে নেয়ার দরকার ছিলো, কিন্তু এরইমধ্যে অনেক সময় নষ্ট করেছে রানা। তাছাড়া পরিকল্পিত হামলার চূড়ান্ত সময়সীমা জানা আছে ওর। তবে এমন একটা সম্ভাবনাময় তথ্য-ভাণ্ডারকে ঘুম পাড়াতে খারাপই লাগলো ওর।

লোক দু'জনের হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিলো রানা। তারপর মিনিমিটাকে অকেজো করলো। প্লাস্টিক আবরণের নিচে অ্যাসল্ট রাইফেলের সাথে জোড়া লাগানো একটা ৪০ এমএম গ্রেনেড লঞ্চারও পেলো ও, প্রচুর অ্যামুনিশন সহ।

অস্ত্র দুটো হাতে আসায় প্ল্যান একটু বদলাতে হলো রানাকে। অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি সাথে রাখতে পছন্দ না করলেও, জার্মান লোক-

টাকে একটা ইয়ার-মাইক্রোফোন পরে থাকতে দেখে খুশি হয়ে উঠলো ও। গ্রেনেড লঞ্চারটাও নিলো, ক্যামোফ্লেজ ভেস্ট-এর পকেটে ভরলো অনেকগুলো গ্রেনেড। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের টুকরোটা মাথায় দিয়ে তিন ফুট লম্বা দরজাটা খুললো। ছাদ থেকে ভবনটার ভেতরে ঢোকার এটাই একমাত্র পথ।

পাথুরে একটা সিঁড়ি, দেয়াল ঘেঁষে মৃদু আলোর একটা উৎসের দিকে নেমে গেছে। শেষ ধাপটা থেকে দশ ফুট ওপরে রয়েছে রানা, প্রথম লোকটাকে দেখতে পেলো। কেরোসিন ল্যাম্পের লালচে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ, আলোর দিকে ঝুঁকে পেপারব্যাক পড়ছে সে। মুখ তুলে সরাসরি রানার দিকে তাকালো।

যেমন নামছিল তেমনি নামতে লাগলো, রানার মধ্যে আড়ষ্ট বা দ্বিধার কোনো ভাব নেই। মুখের সামনে হাত তুলে রেখেছে, ভঙ্গিটা দেখে মনে হবে মাথা থেকে প্লাস্টিক নামাতে যাচ্ছে। জিনিসটা নামাতে যথেষ্ট দেরি করলো ও। যখন বুঝলো বই পড়ুয়া লোকটার কৌতূহল বেড়ে গেছে, তারপর আর দেরি করলো না। কিছু করার আগে আশ-পাশে আর কেউ আছে কিনা জেনে নেয়া দরকার।

সুযোগ হলো না। চেয়ার থেকে সামান্য একটু উঁচু হলো লোকটা, গলা লম্বা করে প্লাস্টিকের নিচের মুখটা ভালো করে দেখতে চাইলো, পরমুহূর্তে বগলের তলায় আটকানো সুইভেল হোলস্টার থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনলো কেজি-নাইন।

এরকম ক্ষিপ্র লোক খুব কমই দেখেছে রানা। ওর তিনটে গুলির একটা বিস্ফোরণ আঘাত করলো লোকটার ওপরের ধড়ে, তারপরও কেজি-নাইন থেকে বেরিয়ে এলো ছয় কিংবা আট রাউণ্ড গুলি, সিঁড়ির পাশের দেয়ালে লেগে ছুটে গেল ওপর দিকে।

ব্যাপারটা এতো অপ্রত্যাশিত যে বোকার মতো নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, নড়ার কথা ভুলে। গুলি শেষ হতে সংবিৎ ফিরলো ওর।

কেউ ছুটে এলো না। বা কোনো শব্দও শোনা গেল না। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। তারমানে ভেতরে আর কেউ নেই। এখনো তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, তা না হলে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ পাশের ভবনগুলো থেকে নিশ্চয়ই শোনা যেতো। তবু, সিঁড়ির উল্টোদিকের বড়সড় ধাতব দরজার দিকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো রানা।

আকার দেখে মনে হলো, ওটা সম্ভবত কোনো ভল্টের দরজা। পুরোদস্তুর একটা সামরিক হেলিকপ্টার অথবা একটা কার্গো প্লেনে করে এখানে আনা হয়েছে ওটাকে।

চিন্তিত হয়ে উঠলো রানা, কারণ লাস আনিমাসের আশপাশে কোনো হেলিপ্যাড বা ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ দেখেনি ও। আস্তানাটার চারদিকে চক্কর দিয়েছে ও, চোখে স্কোপ নিয়ে পরীক্ষা করেছে প্রতিটি গজ। ভাবলো, ক্যামোফ্লেজ নেট গুটিয়ে নিলে কি একটা রোটারি-উইং টাইপের আকাশযান ল্যাণ্ড করতে পারবে? অসম্ভব নয়।

শুধু দরজাটা নয়, মেঝেতে রাখা কাঠের বাক্সগুলোও অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলো রানাকে। ছ'ফুট উঁচু একেকটা, অত্যন্ত শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি। একটা হুলিগান বার ছাড়া ওটা খোলার কথা ভাবাই যায় না। ডেস্কের নিচে লোহার একটা রড পাওয়া গেল, কাজ চলতে পারে।

চেয়ারে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করলো রানা। পেরেকমুক্ত করে ঢাকনিটা খুলে ফেললো। ভেতরের প্যাকেটগুলো স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া।

প্রতিটি প্যাকেটে জমাট বাঁধা কি যেন রয়েছে, স্ফটিকের মতো। কোনো প্যাকেটে এক টুকরো, কোনোটায় একাধিক। জিনিসগুলোর রঙ সাদাটে-হলুদ। পাথরের মতো শক্ত।

প্রথমে চিনতে পারলো না রানা, তারপর কোকেন তৈরির পদ্ধতিটা মনে পড়ে গেল ওর। কোকা পাতা থেকে পেস্ট, পেস্ট থেকে ক্রিস্টাল, তারপর কখনোসখনো, ক্রিস্টাল থেকে রক বা পাথর। কোকেনকে বাজারে ছাড়ার আগে আজকাল প্রায়ই শক্ত পাথরে পরিণত করা হচ্ছে। পদ্ধতিটা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছিল কালভিন। ইংরেজিতে পদ্ধতিটাকে বলা হয়, ফ্রিবেস বা ক্র্যাক। ফ্রিবেস বা ক্র্যাক যে-কোনো ড্রাগসের চেয়ে অনেক বেশি ঘন আর মারাত্মক। এক কিলো কোকেন পেস্ট আর এক কিলো ফ্রিবেসের দামের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য রয়েছে। ফ্রিবেসকে মহার্ঘ্যবস্তু বলা যেতে পারে।

জঙ্গলের ভেতর কিভাবে কোকেন আসছে, এখনো বুঝতে পারছে না রানা। জলাভূমির সবটাই অগভীর, এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। পানিতে সী-প্লেন নামা-ওঠা করতে পারে। জলাভূমিতে অনেক গাছ পড়ে থাকতে দেখেছে ও, ধারণা করেছিল মড়ক লাগায় বা পচন ধরায় ধরাশায়ী হয়েছে ওগুলো। এখন মনে হচ্ছে, সম্ভবত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে ওগুলোকে। সন্দেহ নেই, এ-ধরনের কাজের জন্যে ব্রান্ট অত্যন্ত উপযুক্ত লোক। গাছগুলোকে সরিয়ে দিয়ে পানিপথটাকে যানবাহনের উপযোগী করা হয়েছে। একটা মাত্র প্লেন কয়েক মিলিয়ন ডলারের ফ্রিবেস বহন করতে পারে।

বাক্সগুলোর ভেতর কোকেনের ছোটো একটা করে পাহাড় রয়েছে। রাস্তায় বিলি করে দাও, মহামারীর আধুনিক সংস্করণ দেখতে পাবে। সন্দেহ নেই, কোকেনের এই পাথর সুদূর বাংলাদেশেও পাঠানো

হতো। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির অনুরোধে রাজি হয়ে অ্যাস-ইনমেণ্টটা গ্রহণ করায় নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলো রানা।

কঠিন কোকেনের পরিমাণ আর বাক্সগুলোর আকার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কিভাবে কি করলে সহজেই জিনিসটা ধ্বংস করা যাবে বুঝতে পারছে না। কিছু একটা পাওয়া দরকার, খুঁজতে শুরু করলো, যদিও ঠিক জানে না কি খুঁজছে। এই বিপুল কোকেন ধ্বংস করা সম্ভবই হতো না ভবনটার এক কোণে টলুয়েন-এর ড্রাম তিনটে না পেলে। টলুয়েন কেমিক্যাল সলভেণ্ট, কোকেন পরিশোধনে লাগে। টিএনটি তৈরি করারও একটা উপাদান জিনিসটা। সি-ফোর আর স্থানান্তরিত ড্রামগুলোর মাঝখানে তারের সংযোগ দিলো রানা, ফলে শুধু কোকেন নয়, পাথুরে দেয়ালগুলোর ভেতর যা কিছু রয়েছে, সব উড়িয়ে দেয়া যাবে।

বিস্ফোরণের সাথে সাথে কোকেন সম্রাটের কয়েক বছরের রোজগার মিলিয়ে যাবে বাতাসে। তবে, রানা জানে, এ-ধরনের এক-আধটা আঘাতে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না কার্টেলের। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, মোক্ষম এমন একটা আঘাত করবে যে মুখ থুবড়ে পড়ার পর আবার সিধে হতে কয়েক বছর লেগে যাবে ওদের।

হেনেরিক মুলারকেও ধরবে ও। প্রথম দিকে ব্যাপারটা ছিলো, একজন নাৎসী অপরাধীকে আটক করা। পরে জানা গেছে, মেডিলিন কার্টেলের ব্রেন বলতে মুলারকে বোঝায়। দশ বছর আগে সাঁতেলা লজেন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মঞ্চে প্রবেশ করেন মুয়েলার, ভিক্টরকে পথনির্দেশ দেন, কার্টেলকে গড়ে তোলেন গেস্টাপোর আদলে। বিশ বছর আগে, ধরা পড়ার আতংকে যে সিটাডেলটা তিনি তৈরি করেন, পরে সেটাই ড্রাগ ব্যবসার হেডকোয়ার্টার হয়ে ওঠে।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসার আগে, টেপ দিয়ে কব্জিতে একটা ডিটোনেটর লাগিয়ে নিলো রানা, যাতে পরিবর্তিত যে-কোনো পরিস্থিতিতে ফ্রিবেস কোকেনের পাহাড়টা ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে পারে ও। দু'মিনিট সময় নিয়ে ধ্যান করলো, সাহায্য নিলো অটো-সাজেশন-এর। মনের প্রতিটি অংশে পাঠিয়ে দিলো একটি জরুরী বার্তা, একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ডিটোনেটরটা অ্যাকটিভেট করা। সুইচটা অন করতে এখন আর কোনো রকম দ্বিধায় ভুগবে না রানা, এমনকি মৃত্যুর মুখে পড়লেও।

এরপর উঠনে বেরিয়ে এলো ও, বৃষ্টির ভেতর স্বাভাবিক ব্যস্ততার সাথে হাঁটতে শুরু করলো। হোমিং ডিভাইসটা অ্যাকটিভেট করা যায়, অপারেশনে অংশগ্রহণ করার জন্যে পৌঁছে যাবে ডি. এ. এস., কিন্তু ট্র্যান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করা হতে পারে ভেবে ঝুঁকিটা নিতে চাইছে না। মুয়েলারের কমিউনিকেশন সেন্টারের রেডিও হয়তো বিভিন্ন ওয়েভলেংথে সেট করা নেই, তবু দুর্ভাগ্যবশত ধরা পড়ে যেতে পারে রানা। মুয়েলারের কমিউনিকেশন সেন্টারটা একবার দেখা দরকার। নিশ্চয়ই অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট আছে ওখানে।

নেই মানে! দু'জন লোক রয়েছে ডিউটিতে, বসে আছে সামনে একটা কনসোল নিয়ে। কনসোলে তিনটে রেডিও, একটা রাডার-স্কোপ, সাথে ডিজিটাল ফ্রিকোয়েন্সি ইকুইপমেন্ট। ছোটো বাড়িটায় ঢুকেছে রানা, বাইরে কোনো পাহারা নেই। নিজেকে আড়াল করার কোনো চেষ্টাই করলো না ও, যেন দলেরই একজন লোক সে। আগের মতোই প্লাস্টিকের টুকরোটা দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। লোকগুলোর এতো কাছে এসে দাঁড়ালো, থুথু ছুঁড়লে লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না।

ওদের সাথে কথা বলার ইচ্ছে রয়েছে র উজি বি তুলে খুক

-রে কাশলো ও। ঝট করে মুখ তুললো একজন, একটা হাত ঢুকে যাচ্ছে শো-ল্ডার হোলস্টারে। দ্বিতীয় লোকটা রানার দিকে তাকালোই না, তারও একটা হাত চলে গেল জ্যাকেটের ভেতরে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের মাথার ওপর, ফাঁকা গুলি করলো রানা। এমন বেপরোয়া, আত্মহত্যাপ্রবণ লোক খুব কমই দেখেছে ও। হেরে গেছে, আত্মসমর্পণ না করলে নির্ঘাৎ মৃত্যু, জেনেও ওরা ক্ষান্ত হলো না। রানা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আশেপাশে কোনো আড়াল নেই। দ্বিতীয় লোকটা কেজি-নাইন বের করে ফেললো। প্রথম লোকটা ডাইভ দিলো মেঝে লক্ষ্য করে, তার হাতেও চলে এসেছে আরেকটা কেজি-নাইন। লোকটা ডাইভ দিয়েছে হিসেব করে, মেঝে-তে পড়ামাত্র চমৎকার একটা পজিশন পেয়ে যাবে গুলি করার। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ালো, খুন করার জন্যে গুলি না করে উপায় থাকলো না রানার।

হোমিং ডিভাইসের রেঞ্জ পঁচিশ মাইল। রেঞ্জের ভেতর একটা আকাশ-যান থাকলে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। তবু আরো ভালোভাবে প্রচার করার জন্যে কনসোল-এ বসানো ট্র্যান্সমিটারটা ব্যবহার করলো রানা। লাশ বা রক্ত নিয়ে করার কিছু নেই ওর, কাজেই কমিউনিকে-শন সেন্টারের ইকুইপমেন্টগুলো নষ্ট করলো। তাড়াতাড়ি আরেক বিল্ডিঙে যেতে হবে ওকে, লোকজন যেখানে ঘুমায়।

ফাঁকা উঠনটা পেরিয়ে আসছে রানা। বাড়িটা যখন বিশ গজ দূরে, দরজার ডান দিকে কার্নিসের নিচে একজন গার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ও। হাঁটার গতি একই রকম থাকলো ওর। মাথা আর মুখ ঢেকে রেখেছে প্লাস্টিকের টুকরো। দূরত্ব যখন আর বিশ ফুটের মতো হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো রানা, যেন তাড়াতাড়ি বৃষ্টির হাত থেকে

বাঁচতে চায়।

সরে গিয়ে রানাকে দাঁড়াবার জায়গা করে দিলো লোকটা। ছুটে এসে থামলো না রানা, প্রচণ্ড ঘুসি মারলো তার নাকে। লোকটা নিরেটদর্শন, আঘাতটা আসছে দেখেও কিছু করতে পারলো না। রানা অনুভব করলো, লোকটার চোয়ালের হাড় নড়বড়ে হয়ে গেল। ঢিল পড়লো চোখের পেশীতে। দরজার সামনে জমে থাকা পানিতে মাথা দিয়ে পড়লো সে। ছলাৎ করে একটা শব্দ হলো, ওটাই একমাত্র আওয়াজ। বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এসে লোকটার মাথায় একটা লাথি কষলো রানা। টেনে-হিঁচড়ে অজ্ঞান দেহটাকে রেখে এলো অন্ধকার কোণে।

দরজার দু'দিকে দুটো জানালা, দরজা থেকে প্রতিটির দূরত্ব দশ ফুট। দুটোই খোলা। একটার পাশে দাঁড়িয়ে সাবধানে ভেতরে উঁকি দিলো রানা। প্রথমে চোখে পড়লো অনেকগুলো মশারি। মশারির ভেতর লাইনবন্দী হয়ে শুয়ে আছে লোকজন। কেউ নড়ছে না, যেন ভয়ে সিটকে বা আধমরা হয়ে আছে সবাই। তারপর ড্রামগুলো চোখে পড়লো। বিশাল কামরার জানালা আর দরজাগুলো বাদ দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দুই লাইনে রাখা হয়েছে ওগুলো।

কামরাটার শেষ মাথায় দুটো টেবিলে বসে রয়েছে আরো কয়েকজন লোক, নড়াচড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হলো তাস খেলছে। বারোজনের কম নয়।

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। ঘুমন্ত লোকগুলোকে গ্যাস বোমার সাহায্যে অজ্ঞান করা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু যারা জেগে আছে তারা বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হওয়ামাত্র ছুটোছুটি শুরু করবে, বিভিন্ন দরজা দিয়ে বেরিয়েও আসতে পারবে কেউ কেউ। দরজা একটা হলে,

সেটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো রানা। কে কোন্ দরজা দিয়ে বেরোবে জানার উপায় নেই, বেরিয়ে কোন্ দিকে ছুটবে তাও আগে থেকে বলা যায় না। অথচ সিটাডেল-এর উদ্দেশে রওনা হবার আগে পরে বা পথে কোনো শত্রুর অস্তিত্ব রাখতে চায় না ও।

সব সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে সি-ফোর। সি-ফোরের কয়েকটা বল জানালা দিয়ে কামরার মেঝেতে ফেলতে পারে ও, তারপর নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে ডিটোনেটরের বোতামে চাপ দিলেই রলফ মুয়েলারের শিষ্যরা ইহজগৎ ত্যাগ করবে।

কিন্তু না, ব্যাপারটা অমানবিক হয়ে যায়। ঠাণ্ডা মাথায় একজন লোককেই খুন করা সম্ভব নয় রানার পক্ষে, এখানে তো কমকরেও পঞ্চাশজন রয়েছে। তাহলে উপায় ?

ড্রামগুলোর কথাও ভোলেনি রানা। ওগুলোর ভেতর কি আছে জানা নেই, তবে আন্দাজ করতে পারলো। ইতোমধ্যে গুনেছে ও, বত্রিশটা ড্রাম। প্রতিটি পঞ্চান্ন পাউণ্ডের। ওগুলোর ভেতর কি পরিমাণ কোকেন পেস্ট আছে হিসেব করতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠলো রানার।

এমন একটা উপায় বের করতে হবে, যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। কিন্তু তা কি সম্ভব ? কোকেন পেস্ট নষ্ট করতে হলে, তার আগে সবগুলো লোককে অজ্ঞান করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয়, সি-ফোর দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে, তাতে কোকেনের সাথে অস্তিত্ব হারাবে পঞ্চাশজন মানুষ।

খানিক ভাবতেই একটা বুদ্ধি পেয়ে গেল রানা। একসাথে দুটো কাজ করা যাবে না, এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও। অনেকগুলো জানালা, প্রায় সবগুলোই খোলা, প্রতিটির ভেতর দিয়ে সি-ফোরের

একটা করে বল কামরার মেঝেতে ফেললো ও। সামান্যই শব্দ হলো, বৃষ্টির আওয়াজের সাথে মিশে যাওয়ায় শুনতে পেলো না কেউ। হঠাৎ যদি কারো চোখে পড়ে যায়, খেলার কোনো সামগ্রী বলে মনে হবে তার। গ্যাস বোমাগুলো তো হুবহু টেনিস বলের মতো দেখতে। সে-গুলো এমনভাবে গড়িয়ে দিলো রানা, প্রতিটি গা-ঢাকা দিলো ড্রাম-গুলোর আড়ালে।

কাজ সেরে বাড়িটা থেকে দূরে সরে আসছে রানা। গ্যাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কেউ যদি বাইরে বেরিয়ে আসে, ওর কাছে উজি বি রয়েছে, পাখি শিকারের মতো সহজেই ফেলে দিতে পারবে। আর শত্রুরা যদি সংখ্যায় বেশি হয়, রানার সাথে গ্রেনেড লঞ্চারও আছে।

দশ ফুট চলে এসেছে রানা। বিশ ফুট। বিশ গজ। বৃষ্টি এখনো পড়ছে, তবে আগের মতো জোরে নয়। প্রায় নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে রানা। এখন যদি ডিটোনেটরের সুইচ অন করে সি-ফোর ফাটিয়ে দেয়, ওর কোনো ক্ষতি হবে না। সিটাডেল-এর দিকে হাঁটছে। ইতো-মধ্যে বিস্ফোরিত হয়েছে গ্যাসবোমাগুলো, রঙহীন বিষাক্ত গ্যাস নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে কামরার ভেতর। এই সময় ওর পিছনের বাড়িটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো এক লোক। বলা কঠিন রানাকে দেখে, নাকি গ্যাসের আতংকে, চিৎকার শুরু করলো সে।

ঝট্ করে ঘুরেই উজি তাক করলো রানা। গুলি খেয়ে গুঙিয়ে উঠলো লোকটা, আওয়াজটা শুনে বুঝতে অসুবিধে হলো না গলায় লেগেছে বুলেট। দোরগোড়াতেই পড়ে গেল সে।

সিটাডেল-এর সিঁড়ির নিচে পৌঁছুলো রানা। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন গার্ড। রানাকে উঠন ধরে হেঁটে আসতে দেখেছে তারা। গুলির শব্দও শুনেছে। এক মুহূর্ত সময় পাবার জন্যে টেপ

দিয়ে হাতে আটকানো তিনটে ডিটোনেটরের দ্বিতীয়টার সুইচে চাপ দিলো রানা। পিছনের বাড়িটার দুটো দরজা, সামনের ও পিছনের, একযোগে বিস্ফোরিত হলো। জোড়া বিস্ফোরণের শব্দ মনোযোগ কেড়ে নিলো গার্ডদের।

স্যাৎ করে এক পাশে সরে গেল রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো পাশ ফিরে, এক ধার দিয়ে, প্রতি মুহূর্তে গুলি করছে। প্রথম লোকটা ধরাশায়ী হলো পাল্টা গুলি করার কোনো সুযোগ না পেয়েই। দ্বিতীয় লোকটার তিনটে বুলেট রানার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। রানার হাতে রাইফেলটা অটোমেটিক হলেও, চর্চা না থাকলে র‍্যাপিড ফায়ারে লক্ষ্যভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। অ্যাসাইনমেণ্ট পাবার আগের দু'হপ্তা প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিলো বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিলো ও। দ্বিতীয় লোকটার হাঁটু বেয়ে উঠে গেল বুলেটগুলো, শেষ দুটো বুলেটের একটা লাগলো কপালে, অপরটা মাথার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

এরপর সব যেন স্বপ্নের মধ্যে দ্রুত ঘটতে লাগলো। লাথি মেরে সিটাডেল-এর দরজা খুললো রানা, ব্যাগ থেকে আগেই বের করে ফেলেছে গ্রেনেড লঞ্চারটা। প্রতিবার একটা করে শেল ভরলো, পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক-রেঞ্জ থেকে নিক্ষেপ করলো কামরার ভেতর। ভেতরে লোকজন আছে, টের পেলো রানা। প্রচুর ইকুইপমেণ্টও দেখতে পেলো। সম্ভবত দাহ্য পদার্থ ভরা দু'একটা ড্রামও ছিলো। কারণ হঠাৎ করে লাফ দিয়ে সিলিং ছুঁলো আগুনের শিখাগুলো, প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে পাঁচ ফুট পিছিয়ে এলো রানা, পড়ে গেল।

রানা পড়ে যাবার সাথে সাথে বিস্ফোরিত হলো বত্রিশটা কোকেন ভরা ড্রাম সহ বিশাল শোবার ঘরটা। ডিটোনেটরের সুইচ অন হয়ে গেছে।

পড়ে যাবার পরও গড়িয়ে আরো ছ'ফুট সরে গেল রানা। সিটাডেলের খোলা দরজা দিয়ে নরকের অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাচ্ছে ও। মেঝেতে পিঠ দিয়ে মাথাটা শুধু সামান্য উঁচু করলো, চাপ দিলো আরেকটা ডিটোনেটরে। সাথে সাথে বিস্ফোরিত হলো স্টোর হাউসটা। কেঁপে উঠলো যেন গোটা দুনিয়াটাই, পরবর্তী পাঁচ সেকেণ্ড আরেক জায়গায় কাটলো রানার। আগেই পড়ে গেছে বলে রক্ষা, তা না হলে বুলেটের গতিতে ছুটে আসা ইট আর লোহার টুকরো লেগে ওর শরীরটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতো। বিস্ফোরণের ফলে শুধু ইট, কাঠ লোহা আর পাথর নয়, দিকবিদিক ছুটোছুটি করছে টুকরো টুকরো আগুন। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে, সবগুলোর কারণ বা উৎস রানার জানা নেই। লাফিয়ে উঠছে মাটি, শকওয়েভের ধাক্কায় ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সমস্ত বাতাস। খাড়া হয়ে থাকা একটা জিনিসও আর খাড়া থাকলো না। খোলা উঠন জুড়ে শুরু হলো আগুনের মাতামাতি। কমিউনিকেশন সেন্টারে কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি, অথচ দাউ দাউ করে জ্বলছে সেটা। বাষট্টিজন লোক আর কোকেন পেস্ট ভরা ড্রামগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে শোবার কামরাটা, সেখানে আগুন জ্বলছে কয়েকটা স্তরে ভাগ হয়ে। সদ্য ছাড়া রকেটের মতো আগুনের বলগুলো উঠে যাচ্ছে ভিজে অন্ধকার আকাশের দিকে।

তারপর অনেকটা সময় কাটলো। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে কোনো শব্দ শোনেনি রানা। এমন কোনো কাঠামো বা আকৃতি দেখতে পেলো না যেটাকে ঘিরে ঘন আগুনের লালচে শিখা নাচানাচি করছে না। মনে হলো, প্রতিটি জিনিসই যেন নড়াচড়া করছে। কিন্তু সিধে হয়ে দাঁড়াবার পর দেখলো, সিটাডেল-এর চৌহদ্দি বাদ দিলে আশপাশে কোথাও কোনো জিনিসের আকৃতি অটুট নেই। নিঃসঙ্গ একজন মাত্র

লোককে দেখলো রানা। পুরনো চার্চের দরজায় বেরিয়ে এলো সে, এমন ভঙ্গিতে সামনে হাত বাড়ালো যেন পবিত্র পানি পেতে চায়। ভঙ্গিটা বদলালো না, সটান আছাড় খেলো সে। বৃষ্টি কমে আসায় তার পতনের আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা, মনে হলো পাথরের চাতালে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেল হাড়গুলো।

লাস আনিমাসে কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হলো না। বিস্ফোরণে চারপাশের প্রতিটি ভবন মাটির সাথে সমান হয়ে গেছে। নিচের উঠনে একটা পাঁচিলও উঁচু হয়ে নেই। ক্যামোফ্লেজ নেটগুলোও রক্ষা পায়নি, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রানা উপলব্ধি করলো, অক্ষত আছে ও। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো ওর। মনে হলো, জায়গাটা আগের চেয়ে নিরাপদ ওর জন্যে। ট্রেনিং পাওয়া একদল লোকের সাথে লড়তে হবে না ওকে। এখন শুধু একটাই চিন্তা—রলফ মুয়েলার।

হেনেরিক মুলার কোথায় লুকিয়ে আছেন জানে রানা। সন্ধ্যার সময় তাঁকে হাঁটতে দেখেছে ও, দেখেছে ঠিক কোনখানটায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সিটাডেল-এর ডান দিকের কোণে।

রলফ মুয়েলার অদৃশ্য হয়ে যাবার পর স্পটার স্কোপ দিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করেছে রানা। রহস্যটা ভেদ করা সম্ভব হয়েছে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা ট্রেঞ্চ। মাটি ফুঁড়ে নিচের দিকে নেমে গেছে কংক্রিটের তৈরি একটা র‍্যাম্প। ফেরারি নাৎসী অপরাধী আক্ষরিক অর্থেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে হারিয়ে গেছেন।

এই মুহূর্তে সিটাডেল-এর নিচে রয়েছেন হেনেরিক মুলার। নিজের বাংকারে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

# চোদ্দ

'হেনেরিক মুলার ?'

'আপনি কে বলছেন, প্লিজ ?'

ইয়ার-মাইক্রোফোনে শান্ত সুরে কথা বলছে রানা। দু'মুখো মাইক্রোফোন ওটা, ট্র্যান্সমিটার ও রিসিভার হিসেবে কাজ করে। মাটির নিচ থেকে যোগাযোগ রাখার জন্যে নিজের লোকদের মধ্যে যন্ত্রটা বিলি করেছেন মুলার। বোঝা যায়, অত্যন্ত শক্তিশালী। 'আমি মাসুদ রানা,' বললো ও। 'নামটা আপনি জানতেও পারেন।'

মুলার জানেন। এই লোকই খুন করেছে তাঁর ছেলে ববি মুয়েলারকে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মাসুদ রানাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর নির্দেশ এখনো পালন করা হয়নি। থেমে থেমে কথা বললেন তিনি, গলাটা একজন বুড়ো লোকের, সামান্য জার্মান টান থাকলেও সুরটা আক্রমণাত্মক নয়। 'বলুন, মিঃ রানা।'

'আপনার অপারেশন ব্যর্থ হয়ে গেছে, মুলার। হোয়াইট গামাকে আরেকটা হেডকোয়ার্টার ও গোডাউন খুঁজে নিতে হবে। নতুন একজন নেতাও দরকার হবে। দরকার হবে আরেকজন উপদেষ্টা, মাস্টার-

যাইতের।'

ওয়্যার-মাইক্রোফোনে কোনো শব্দ হলো না।

'বিরাট একটা সশস্ত্র বাহিনী যে-কোনো মুহূর্তে পৌছে যাবে এখানে,' বললো রানা। 'আপনার পালানোর কোনো উপায় নেই। এই কথাটা বলবার জন্যে আপনার সাথে যোগাযোগ করেছি। বাংকারের ঢোকার পথে বিস্ফোরক বসানো হয়েছে। আপনি আত্মসমর্পণ না করলে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে চার্জগুলো ডিটোনেট করবো আমি।'

'আপনার কাজে কোনো খুঁত থাকে না, মিঃ রানা।'

'চেষ্টা করি যাতে না থাকে।'

'ঠিক আছে,' বললেন মুলার, মনে হলো সেকেণ্ড গোনা শেষ করলেন এইমাত্র। 'আপনি নিচে আসতে পারেন।'

রানা ভাবতে পারেনি এতো সহজে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পাওয়া যাবে। আশা করেছিল মুলার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন, ডিটোনেটরে চাপ দিয়ে সি-ফোর ফাটিয়ে দেবে ও।

র‍্যাম্পের নিচে প্রেশারাইজড্ দরজা খুলে গেল, বাংকারে একা নেমে এলো রানা। পরিস্থিতিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার সুযোগটা হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হলো না। যতোক্ষণ চোখের আড়ালে থাকবেন মুলার, পরিস্থিতিটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ফলে একের পর এক প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ পাবেন তিনি। যেমন, বলতে পারেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন। চল্লিশ বছর আগে বিধ্বস্ত বার্লিনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করার ইচ্ছেটা দমন করেছিলেন গেস্টাপো প্রধান, কারণ তখন তাঁর সামনে পালাবার পথ খোলা ছিলো। আজ তাঁর সামনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর মাত্র একটা পথ খোলা আছে, আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু পুরনো পাপী, ধরা দেয়ার চাইতে আত্মহত্যাটাই পছন্দ করবেন তিনি। তাঁর

মতো একজন নর্দমার কীটকে এভাবে মরে গিয়ে বেঁচে যেতে দেবে না রানা। ঝুঁকি নিয়ে হলেও, হেনেরিক মুলারকে জীবিত ধরতে হবে। ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করার মধ্যে এক ধরনের সন্তুষ্টি আছে, সেটা রানা তাঁকে পেতে দিতে চায় না।

বাংকারে ঢোকার পর বিস্মিত হলো ও। স্বস্তিকা বা প্রাচীন টিউটনিক বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে সাজানো প্রতীক চিহ্ন আশা করেনি ও, আশা করেনি এতো সব আধুনিক যোগাযোগ সরঞ্জাম। বাংকারটা চৌকো, ওপরের চার্চের আদলে তৈরি করা। মিল বলতে ওইটকুই। একদিকের দেয়ালে অনেকগুলো র‍্যাকে এমন সব কমিউনিকেশন ইকুইপমেণ্ট আর কমপিউটার রয়েছে, ব্যবহার করার সুযোগ পেলে গর্ব বোধ করতো বি. সি. আই.। অপর দিকের দেয়ালে রয়েছে অ্যাকুয়ারিয়াম আর সাপের খাঁচা। খাঁচার ভেতর একজোড়া নমুনা দেখে মনে হলো, বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস।

এই অদ্ভুত পরিবেশের মাঝখানে, অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা আগন্তুকের মতো, বসে আছেন হেনেরিক মুলার। কালো একটা নোমেক্স স্যুট পরে আছেন তিনি, হাঁটু আর কনুইয়ের কাছে চামড়ার অতিরিক্ত আবরণ। জুতো পরেছেন কালো। তাঁর সামনের ডেস্কে পড়ে থাকা হেলমেটটাও কালো, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের শীল্ড সহ। আধুনিক অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিটের সদস্যরা ব্যবহার করে ওটা, গভীর জঙ্গলের ভেতর একজন টেরোরিস্টের কাছে জিনিসটা রয়েছে দেখে খানিকটা অবাকই হলো রানা। তবে, মুলারের মতো একজন সারভাইভালিস্ট যে যে-কোনো পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। ছোটোখাটো যুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর তো থাকতেই হবে।

'আপনি অনেক দূর চলে এসেছেন, গ্রুপেনফুয়েরার,' বললো

রানা। 'কংগ্রাচুলেশন্স।'

মাথা ঝাঁকালেন মুলার, স্যুটের হাফ-হুড আর দাগবহুল মুখের জীর্ণ ত্বক তাকে একটা প্রাচীন সরীসৃপের চেহারা পাইয়ে দিলো। চোখ দুটো উজ্জ্বল, কিন্তু বড়বেশি অনড়, যেন চোখের পিছনে মাথাটা দ্রুত কাজ করছে না। চুলবিহীন একজন মানুষ বলা যায় তাঁকে। ঠোঁট বলতে কিছু নেই। 'আপনি খুব জেদি লোক, মিঃ রানা। তার কারণ সম্ভবত এই যে আপনি আমেরিকান নন। ব্যাপারটা আমি বুঝি না তা নয়—দরিদ্র একটা দেশের প্রতিনিধিকে জেদি হতে হয়, তার আর সব অভাব পূরণ করে ওটা। ঠিক জানি না, আপনার বোধ-হয় আরো কিছু গুণ আছে, যা একজন আমেরিকান বা ধনী কোনো দেশের এসপিওনাজ এজেন্টের মধ্যে পাওয়া যাবে না।'

'আপনি সি. আই. এ.-র সাথে কাজ করেছেন,' বললো রানা। 'ক্ল্যানডেসটিন অপারেশন বলতে কি বোঝায় ওরা জানে না। সবচেয়ে খারাপ জিনিসটা কিনে ওরা মনে করে সবচেয়ে ভালোটা কিনতে পেরেছে। এ-সব তো আমার চেয়েও ভালো জানেন আপনি।'

হাসলেন মুলার, দাঁতগুলো নকল হলেও অত্যন্ত সুন্দর। 'আপনার কোর্স চার্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমি,' বললেন তিনি। 'কিন্তু আপনি বোগোটা থেকে ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল না করে রওনা হলেন, সেই থেকে আপনাকে আমি হারিয়ে ফেললাম।'

'আমিও আপনার ট্রেইল বেশ কয়েকবার হারিয়ে ফেলি,' বললো রানা। 'কখনো কখনো এমন-সময়ও গেছে, পুরো এক হপ্তা কোনো ধারণা ছিলো না আপনি বেঁচে আছেন কিনা।'

'কি দেখে আপনি আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন?'

'সাপ,' বললো রানা। 'ওগুলোর ওপর রয়েছে আপনার স্বাক্ষর।

ফেরারি একজন মানুষকে প্রতিটি দুর্বলতার জন্যে খেসারত দিতে হয়।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন মুলার, তাঁর কোটের হাফ-হুড ঘাড় আর গলার বিবর্ণ চামড়া ফুলিয়ে দিলো। রানা বাংকারে ঢোকার পর থেকে তাঁর চোখ একবারও অন্য দিকে সরেনি, সরাসরি ওর চোখে তাকিয়ে আছেন, ভুলেও একবার পলক ফেলেননি। 'নিজের ক্ষেত্র ছেড়ে যা-ই করতে যাই আমরা, অ্যামেচার হয়ে উঠি,' বললেন তিনি। 'ওরা আমাকে বললো, আমি নাকি নতুন একটা নমুনা আবিষ্কার করেছি। শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বিজ্ঞানে এটা আমার প্রথম অভিযান। ভাগ্যগুণে নমুনাটা পেয়ে যাই। আমাদের বোঝা উচিত, ভাগ্য বারবার সহায়তা করে না, নানাদিক থেকে তো নয়ই।'

'ভাগ্যের সহায়তা পাননি বা যা-ই বলুন, কাজটা আপনি নেহাতই বোকার মতো করেছেন,' বললো রানা। 'এধরনের বোকামি খুব একটা করেননি আপনি। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী একটা দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রধান ছিলেন। একটা পুতুলকে দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কলম্বিয়ান রাজনীতিতে একটা শক্তি হিসেবে উদয় হতে পারতো সে। লোকটা মরার জন্যে তৈরি ছিলো না বলে নিজেকে দোষ দেবেন না।'

চোখের চারপাশে কুঁচকে ফুলে থাকা মাংসে ঢিল দিলেন মুলার। 'আমি কোথায় আছি তা কি আপনাকে ভিক্টর জানিয়েছে?'

'যতোটা সম্ভব কম জানিয়েছে সে,' বললো রানা। 'আপনার উচ্চাশাই আমার সূত্র হিসেবে কাজ করেছে, গ্রু পেনফুয়েরার। কোকা পেস্ট অনুসরণ করে আপনার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আমি। বীমার ব্যবস্থা করতে গিয়ে নিজের অবস্থান প্রকাশ করার ঝুঁকি নিয়েছেন

আপনি। এখানে কোকেন রক আর পেস্ট মউজুদ করে আপনি ভেবেছিলেন, এগুলোর বিনিময়ে যা কিছু হারিয়েছেন সব ফেরত পাবেন। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, প্ল্যান করেছেন বড় মাপের সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবেন, অস্থির করে তুলবেন কলম্বিয়ার জনসাধারণকে। সরকারকে অচল করে দেয়ার পর ভিক্টরকে মুক্ত করার জন্যে সি. আই. এ.-র সাথে দর কষাক্তে চেয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্ল্যানটা সফল হতে পারতো। কণ্ট্রাদের মাঠে রাখার বিনিময়ে যে-কোনো কাজে রাজি হতো সি. আই. এ.। কোন্‌টা যে বেশি খারাপ আমার জানা নেই—ইরানিয়ানদের কাছে মিসাইল বিক্রি, নাকি কার্টেলের কাছ থেকে টাকা নেয়া।'

আবার হাসলেন মুলার। ঠোঁটহীন মুখে যেন একটা ক্ষতের সৃষ্টি হলো। 'আপনি ঠিক জানেন, মিঃ রানা, সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে?'

'আপনার জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেছে। আপনার হয়ে যারা কাজ করেছে তারা সবাই মারা পড়বে। ভিক্টরকে বাঁচাতে পারে এমন কিছু আপনি করতে পারবেন না। আপনি এমনকি নিজেকেও বাঁচাতে পারবেন না। এবার হাত দুটো ডেস্কের ওপর রাখুন, তালু ওপর দিকে। হঠাৎ কিছু করবেন না।'

হঠাৎ করে কিছুই করলেন না মুলার, তবে হাত দুটো ডেস্কের পিছন থেকে তোলার পর দেখা গেল, তিনি একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড ধরে রয়েছেন।

গুলি করতে গেল রানা। আধ সেকেণ্ড দেরি করলো, বদ্ধ বাংকারের ভেতর বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে হিসেব করলো, সিদ্ধান্ত নিলো গুলি না করার। বয়স যতোই হোক, অত্যন্ত সতর্ক মুলার, কি

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বুঝতে দেরি করলেন না। তারপর মুখ খুললেন তিনি, 'না, মিঃ রানা, এ-ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একমত—আপনিও বাঁচবেন না।'

উত্তর দিলো না রানা, নানা রকম সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছে ও। কোনোটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না। সময় না দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মুলার।

'এখন আমি দরজার দিকে এগোবো, মিঃ রানা।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন মুলার, এক হাতে গ্রেনেড, অপর হাতে হেলমেট।

'যদি দেখি মাথায় হেলমেট তুলছেন,' বললো রানা, 'আপনাকে আমি খুন করবো।'

থামলেন মুলার। সব খেলারই নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এমনকি কিস্তি-মাত-এর সময়েও। বড় করে, একবার, মাথা ঝাঁকালেন তিনি। মেনে নিলেন। 'দরজার দিকে হাঁটবো আমি,' অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে, জোরালো গলায় বললেন।

এগোলেন মুলার। আত্মবিশ্বাসের সাথে, দৃঢ় ভঙ্গিতে পা ফেললেন, ধীরে ধীরে। তাঁর হাবভাবের মধ্যে শিথিলতার কোনো লক্ষণ নেই, নেই বুড়ো মানুষের জড়তা। রোবটসুলভ একটা আড়ষ্ট ভাব নিয়ে এগোলেন তিনি। একটা মাত্র উপায় আছে রানার, সরাসরি মুলারের মুখে গুলি করা। গুলি করেই ডাইভ দিয়ে ডেস্কের পিছনে পড়বে। বাকিটা ছেড়ে দেবে ভাগ্যের ওপর।

না, স্রেফ.বোকামি হবে কাজটা।

ও নিজেই বরং দরজার দিকে ছুটুক।

মন্দ নয়, তবে ভালোও নয়।

বুড়োকে তাহলে চলে যেতে দিক।

আপনি। এখানে কোকেন রক আর পেস্ট মউজুদ করে আপনি ভেবেছিলেন, এগুলোর বিনিময়ে যা কিছু হারিয়েছেন সব ফেরত পাবেন। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, প্ল্যান করেছেন বড় মাপের সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেবেন, অস্থির করে তুলবেন কলম্বিয়ার জনসাধারণকে। সরকারকে অচল করে দেয়ার পর ভিক্টরকে মুক্ত করার জন্যে সি. আই. এ.-র সাথে দর কষাতে চেয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্ল্যানটা সফল হতে পারতো। কণ্ট্রাদের মাঠে রাখার বিনিময়ে যে-কোনো কাজে রাজি হতো সি. আই. এ.। কোন্‌টা যে বেশি খারাপ আমার জানা নেই—ইরানিয়ানদের কাছে মিসাইল বিক্রি, নাকি কার্টেলের কাছ থেকে টাকা নেয়া।'

আবার হাসলেন মুলার। ঠোঁটহীন মুখে যেন একটা ক্ষতের সৃষ্টি হলো। 'আপনি ঠিক জানেন, মিঃ রানা, সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে ?'

'আপনার জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেছে। আপনার হয়ে যারা কাজ করেছে তারা সবাই মারা পড়বে। ভিক্টরকে বাঁচাতে পারে এমন কিছু আপনি করতে পারবেন না। আপনি এমনকি নিজেকেও বাঁচাতে পারবেন না। এবার হাত দুটো ডেস্কের ওপর রাখুন, তালু ওপর দিকে। হঠাৎ কিছু করবেন না।'

হঠাৎ করে কিছুই করলেন না মুলার, তবে হাত দুটো ডেস্কের পিছন থেকে তোলার পর দেখা গেল, তিনি একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড ধরে রয়েছেন।

গুলি করতে গেল রানা। আধ সেকেণ্ড দেরি করলো, বদ্ধ বাংকারের ভেতর বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে হিসেব করলো, সিদ্ধান্ত নিলো গুলি না করার। বয়স যতোই হোক, অত্যন্ত সতর্ক মুলার, কি

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বুঝতে দেরি করলেন না। তারপর মুখ খুললেন তিনি, 'না, মিঃ রানা, এ-ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একমত— আপনিও বাঁচবেন না।'

উত্তর দিলো না রানা, নানা রকম সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছে ও। কোনোটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না। সময় না দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মুলার।

'এখন আমি দরজার দিকে এগোবো, মিঃ রানা।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন মুলার, এক হাতে গ্রেনেড, অপর হাতে হেলমেট।

'যদি দেখি মাথায় হেলমেট তুলছেন,' বললো রানা, 'আপনাকে আমি খুন করবো।'

থামলেন মুলার। সব খেলারই নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এমনকি কিস্তি-মাত-এর সময়েও। বড় করে, একবার, মাথা ঝাঁকালেন তিনি। মেনে নিলেন। 'দরজার দিকে হাঁটবো আমি,' অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে, জোরালো গলায় বললেন।

এগোলেন মুলার। আত্মবিশ্বাসের সাথে, দৃঢ় ভঙ্গিতে পা ফেললেন, ধীরে ধীরে। তাঁর হাবভাবের মধ্যে শিথিলতার কোনো লক্ষণ নেই, নেই বুড়ো মানুষের জড়তা। রোবটসুলভ একটা আড়ষ্ট ভাব নিয়ে এগোলেন তিনি। একটা মাত্র উপায় আছে রানার, সরাসরি মুলারের মুখে গুলি করা। গুলি করেই ডাইভ দিয়ে ডেস্কের পিছনে পড়বে। বাকিটা ছেড়ে দেবে ভাগ্যের ওপর।

না, স্রেফ বোকামি হবে কাজটা।

ও নিজেই বরং দরজার দিকে ছুটুক।

মন্দ নয়, তবে ভালোও নয়।

বুড়োকে তাহলে চলে যেতে দিক।

খুলির ভেতর ছুরি চালাবার ব্যথা অনুভব করলো রানা। হাতে পেয়ে মুলারকে ছাড়তে রাজি নয় ও।

আরো এক পা এগোলেন মুলার, পৌঁছে গেলেন দোরগোড়ায়। 'এখন আমি বাংকার থেকে বেরিয়ে যাবো,' আগের মতোই দৃঢ়কণ্ঠে, শান্তভাবে বললেন তিনি। 'আমার পিছনে বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাচ। আমরা একমত?'

কিছু বললো না রানা। অটোমেটিক রাইফেল আর মুলারের মাঝখানে দূরত্ব বাড়বে, তাতে রানারই সুবিধে। লংরেঞ্জ থেকে গুলি করলে, মুলারের হাতের গ্রেনেড যদি বিস্ফোরিত হয়, রানার আহত হবার আশংকা খানিকটা হলেও কমবে।

মুলার জানেন, দরজা বন্ধ করতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগবে তাঁর। তিনি সম্ভবত ধরে নিয়েছেন, বাংকার থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে পারলেই পালাতে পারবেন। তিনি জানেন, রানা তাঁকে অনুসরণ করে এলে দরজা বন্ধ করা কঠিন হবে। অন্তত কয়েকটা সেকেণ্ড রানা যদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে, দরজা বন্ধ করা যাবে না।

সাবধানে, সতর্কতার সাথে, চৌকাঠের ওদিকে একটা পা ফেললেন তিনি। 'আপাতত বিদায়, মিঃ রানা।'

বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে, অন্য কোথাও। বেঁচে থাকলে আবার সুযোগ পাওয়া যাবে। নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে রানা। ভারি দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাকিয়ে থাকলো ও। ধীরে ধীরে ঘুরছে প্রেশারাইজড হুইল, সীল করে দিচ্ছে বাংকার। হুইলটা ঘোরা বন্ধ হতেই অকস্মাৎ উপলব্ধি করলো রানা, মুলারকে পালাতে দেয়া যায় না।

এক পা এগোলো ও, ডাইভ দিলো ডেস্কের পিছন দিকে। শূন্যে

থাকতেই ডিটোনেটরের সুইচে চাপ দিলো ও।

বিস্ফোরিত হলো বাংকার।

# পনেরো

জ্ঞান ফেরার পর রানার মনে হলো, অগভীর পানিতে পড়ে রয়েছে ও, নড়াচড়া করার শক্তি নেই। ভাবলো, জলাভূমিতে এলাম কিভাবে? পিঠে, হাতে আর মাথায় ব্যথা অনুভব করলো। আরো কয়েক সেকেণ্ড পর নগ্ন পায়ের চামড়ায় সুড়সুড়ি লাগলো।

নরম কি যেন একটা। রানার পায়ের ওপর ধীরে ধীরে নড়ছে। ভয় লাগলো, তবে একটা কথা ভেবে খুশিও হলো। স্পর্শ অনুভব করতে পারছে, তারমানে পুরোপুরি প্যারালাইজড হয়নি ও। সম্ভবত জোরালো ধাক্কা খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশীগুলো, তার বেশি কিছু না।

ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো, এখনো বাংকারে রয়েছে ও। বিস্ফোরণের ফলে সবগুলো আলো নিভে গেছে। ওপরতলার চার্চে আগুন লাগায়, বাংকারের ভেতর বাতাস গরম। খোলা হ্যাচওয়ে দিয়ে বনভূমির ঠাণ্ডা বাতাসও ঢুকছে মাঝে-মধ্যে। ওদিক থেকে সামান্য লালচে

আলোও ঢুকছে বাংকারের ভেতর। শুধু লালচে নয়, নাচানাচি করছে আলোটা। তারমানে আগুনের আভা। এখনো জ্বলছে বাইরেটা।

কিছু করার দরকার নেই, ভাবলো রানা। ডি. এ. এস. না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই হবে। দিন দুয়েক বিশ্রাম নিলেই আবার সুস্থ হয়ে উঠবে ও। এই সময় পায়ে আবার সুড়সুড়ি লাগলো।

কি ওটা? এবার যেন আগের চেয়ে ভারি লাগছে। খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে জিনিসটা। হাঁটুর নিচে, হাড় ছুঁয়ে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ, আতংকের সাথে, বুঝে ফেললো রানা। ধীরগতি, শুকনো··· সাপ। বথরপস জারারাকুকু সিটাডেলিস।

বিস্ফোরণে ডান দিকের দেয়াল থেকে সাপের খাঁচা ভেঙে পড়েছে। পানি সহ মাছগুলো ছিটকে পড়েছে মেঝেতে, খালি হয়ে গেছে সাপের খাঁচা।

দুনিয়ার আর সব সাপের মতো, সিটাডেলিসও উষ্ণতা খুঁজে বেড়ায়। গ্ল্যানড-এর সাহায্যে সন্ধান করে ওগুলো, থেমে থেমে উৎসের দিকে এগোয়। খিদে পেলে, শিকারের অবস্থান জেনে নেয় থারমাল সেনসর-এর সাহায্যে, তারপর শিকার করে। পেট ভরা থাকলে, সেনসরগুলোকে ব্যবহার করে আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিত হবার কাজে, কোনো ভুল করলে তা শুধরে নেয়ার জন্যে নির্ভর করে নিজেদের মারাত্মক বিষের ওপর। মুলারের উপ-প্রজাতির কামড় বিশেষ ভাবে টক্সিক বলে বিবেচিত।

বিষাক্ত সাপের হাত থেকে বাঁচার নিয়ম হলো, শান্ত থাকা, অনড় থাকা।

স্থির থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো রানার। ওর পা বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে সাপটা। ওর শরীরের উষ্ণতম অংশ হলো, জানে

ও, দুই উরুর মাঝখানটা—কোল। আগের চেয়ে বেশি ভারি লাগছে ওটাকে, কারণ উরুর ওপর পুরোটা দৈর্ঘ্য নিয়ে উঠে পড়েছে। অনুভব করলো, তলপেটে উঠে এসে থামলো ওটা।

এবার ওগুলো দেখতে পাচ্ছে রানা—চোখগুলো। প্রায় অন্ধকার বাংকারে ভিজে আলোর চকমকে দুটো বিন্দু। হ্যাচওয়ে থেকে আসা ম্লান আলোয় চোখ দুটোর পিছনে সাপটাকে মনে হলো ঘোমটা পরা, কেমন যেন অশ্লীল, বীভৎস আর ভীতিকর।

তলপেটে স্থির হয়ে আছে ওটা। রানাও এক চুল নড়ছে না। বিকল্প-গুলো নিয়ে চিন্তা করতে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় নিলো না ও। একটা ব্যাপারেই শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনোভাবে যেন কামড়ে দিতে না পারে। সাপ হিসেবে সিটাডেলিস মারমুখো হলেও, দ্রুতগতি নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সুযোগের সন্ধানে থাকলে ওগুলোকে মারা সম্ভব।

নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করলো রানা। দেখতে হবে ওর দ্বারা, এই আড়ষ্ট শরীর নিয়ে, কোনো প্রাণীকে খুন করা সম্ভব কিনা। বাইরে থেকে দেখা যায় না এমনভাবে ডান হাতের পেশীতে চাপ বাড়ালো ও। প্রচুর সময় নিলো ও। আঙুলগুলো এক করলো। মুঠো পাকালো হাতটা। বোঝা গেল, অন্তত শরীরের ওপরদিকটা প্যারা-লাইজড হয়নি। যে-কারণেই আড়ষ্ট হয়ে থাক পেশীগুলো, এখন আর আড়ষ্ট হয়ে নেই।

ঠিক সময়েই আড়ষ্ট ভাবটা দূর হয়েছে। আবার উষ্ণতার সন্ধানে মাথা তুললো সাপটা। পেট বেয়ে উঠে এলো ওটা, উঠে এলো রানার বুকে। ঠাণ্ডা, পলকহীন চোখ দুটো সরাসরি রানার মুখে তাকিয়ে আছে। যদিও রানা দেখতে পাচ্ছে না, তবে অনুভব করতে পারলো

সাপটার জিভ ঘন ঘন বেরিয়ে আসছে মুখের ভেতর থেকে। জিভের নড়াচড়া পালকের মতো হালকা, ছোবল মারার আগের মুহূর্তের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেলো না, তবু ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। আর এক সেকেণ্ডও দেরি করা উচিত নয়।

অক্ষত হাতটা দিয়ে আঘাত করলো রানা। সিটাডেলিসের মাথার পিছনটা আঁকড়ে ধরলো ও, হাতটা লম্বা করে দিয়ে শরীর থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখলো, বেল্টের খাপ থেকে ডান হাত দিয়ে বের করে আনলো ছুরিটা। আংশিক কুণ্ডলী পাকিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করলো সিটাডেলিস, তারপর চাবুকের মতো আঘাত করলো রানাকে। সাপের গায়ে এতো জোর, ধারণা ছিল না রানার। ফণা সহ মুখটা মাত্র কয়েক ইঞ্চি মুক্ত, তাসত্ত্বেও রানার হাতে ছোবল মারার চেষ্টা করলো ওটা। সপাং সপাং আওয়াজ তুলে রানার পায়ে বাড়ি খাচ্ছে লেজটা। ছুরির এক কোপে সাপটাকে দু'টুকরো করলো রানা।

এতোক্ষণে কেন যে আতংকিত হলো রানা, বলতে পারবে না। সিটাডেলিসের মাথাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ও, সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে উপলব্ধি করলো অসুস্থ বোধ করছে। চৈতন্য হারাবার মতো আচ্ছন্ন একটা ভাব গ্রাস করতে চাইছে ওকে। ডেস্কের কিনারায় হেলান দেয়ার সময় ভাবলো, আসলে সাপটার গায়ে অতোটা জোর ছিলো না, নিজে দুর্বল বলে ওরকম মনে হয়েছিল।

ঠিক এই সময় ওর গোড়ালির ওপর কঠিন, তীক্ষ্ণ একটা আঘাত লাগলো। সাথে সাথে বুঝলো রানা, দ্বিতীয় সাপটা কামড়ে দিয়েছে ওকে। ওটাকে দেখেনি ও, এখনো দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু জানে। ভয়ানক জ্বালা করছে ক্ষতটা। ইতোমধ্যে এসআইজি-২১০ টা হোল-

স্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে, গুলি করতেও দেরি করলো না রানা। মাজল ফ্ল্যাশ-এর আলোয় দেখা গেল সাপটাকে। আবার গুলি করলো ও।

দ্বিতীয় গুলিটা লাগায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ডেস্কের পিছনে সরে গেল দ্বিতীয় সিটাডেলিস। শূন্য থেকে মাথাটা পড়লো ওর ব্যাগের ওপর। উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে রানা, আবার একটা সাপকে ছোঁয়ার ইচ্ছে বা সাহস নেই ওর, অথচ ব্যাগটাও ওর দরকার। ঝুঁকলো ও, সাপটার দিকে ছুরি চালালো। আবার ছোবল মারলো ওটা।

কামড়টা মাংসে বিঁধলো না। ছুরির ধারালো ব্লেডে চেপে বসলো সাপের চোয়াল, খুলির দিকে অর্ধেক পথে সেঁধিয়ে গেল। অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য। মনে হলো অসম্ভব। এ যেন মুলারের আত্মা তার পোষা সরীসৃপের ওপর ভর করেছে, অন্ধ আক্রোশে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।

কখন ব্যাগটা তুলে নিয়েছে. ধীর পায়ে হাঁটা ধরেছে খোলা হ্যাচ-ওয়ের দিকে, বলতে পরবে না রানা। বিধ্বস্ত দরজার ওপর বসে পড়লো ও। কারমান আভারোর নির্দেশগুলো মনে করার চেষ্টা করছে ও। তার নির্দেশ মতো ইঞ্জেকশনগুলো নিয়ে এসেছে রানা। ব্যাগে রয়েছে চার ভাইল পোলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনিন, সাথে বড় একটা হাইপডার-মিক। শক ঠেকাবার জন্যে ব্যাগে অ্যান্টিহিসটামিনও আছে। যতোটা সম্ভব স্থির ও অনড় থাকতে হবে ওকে।

দ্রুত কাজ করতে চাইলেও, রানা উপলব্ধি করলো, কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারছে না। এরইমধ্যে শরীরে বিষের প্রতিক্রিয়া অনুভব করছে ও। আরেকটা জিনিস বিঘ্ন সৃষ্টি করলো কাজে। দর-জার বাইরে, ঢালু র‍্যাম্পে, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ফ্ল্যাশ শীল্ডটা পড়ে রয়েছে। দরজা দিয়ে বেরোবার সময় হেনেরিক মুলারের কাছে ছিলো ওটা।

হেলমেটটার ভেতর একটা হাত রয়েছে। আরো সামনে পড়ে রয়েছে একটা বুট, বুটের ওপরে বেরিয়ে রয়েছে সরু মাংসের ফালি আর শিরা। চারদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত।

স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করলো রানা। মুলারকে জীবিত পেতে চেয়েছিল ও। তবে এ-ও মন্দ হয়নি।

ইঞ্জেকশন নেয়ার পর ব্যাগের ওপর মাথা দিয়ে লম্বা হলো রানা। কারমান আভারোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'যদি সাথে সাথে অ্যান্টিভেনিন নেয়া যায়, বেঁচে যাবার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।'

বেঁচে থাকার সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগ, তাই বা মন্দ কি—ভাবলো রানা। ইহলোক বা পরলোক, ওর জন্যে দুটোই সমান। জীবন থাকলে, সেখানে কিছু দায়িত্ব আর কাজ থাকবে। নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে সিরিয়াস, সৎ একজন লোকের তাহলে আর চিন্তা কি? জ্ঞান হারাবার আগে একটা শব্দ শুনলো রানা। হেলিকপ্টার?

'আমার ধারণা, বিষক্রিয়ায় আপনার মতিভ্রম ঘটেছিল,' বললেন কর্নেল বেনিন। হাসিখুশি আর তৃপ্তির ভাব ফুটে রয়েছে তাঁর চেহারায়, একজন অসুস্থ লোকের বিছানার পাশে সাধারণত যা দেখা যায় না। 'সাপ কামড় দেয় নিজেকে বাঁচাবারি প্রয়োজনে। মরা বা আহত সাপ, ওটা কেন আপনাকে কামড়াতে যাবে? তবে, রেকর্ড আছে, তারও রেকর্ড আছে। গলা কেটে ফেলা হয়েছে, তারপরও কামড়ে দিয়েছে সিটাডেলিস। নাগালের মধ্যে পেলে, খোঁচা মারলে কামড়াবে না? আরো আশ্চর্য কথা হলো, আমি শুনেছি, সাপটা মারা যাবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরও বিষটা মারাত্মক।'

সাপ আর সাপের বিষ সম্পর্কে এ-ধরনের কতো যে গল্প লেটিসি-

খায় শুনেছে রানা তার ইয়ত্তা নেই। এখন আবার মেডিলিনেও শুনতে হচ্ছে। একটা গল্প বারবার শুনতে হয়েছে ওকে। এক যুবতীর স্বামীকে সিটাডেলিস কামড়ে দেয়। 'ঈশ্বর, আমাকে কেন কামড়ালো না!' বলতে বলতে স্বামীর সেবা করেছে সে। ক্ষতটা পরিষ্কার করার সময় তার আঙুলের ডগায় খানিকটা বিষ লাগে। মশলা পেষার সময় সেই বিষ মিশে যায় হলুদ আর আদায়। সেই হলুদ আর আদা দিয়ে তরকারি রান্না করে খায় বউটা। স্বামী মারা গেল, তার সাথে মারা গেল সে-ও। ঈশ্বর তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

মেডিলিনে আসার পর আগের চেয়ে অনেক সুস্থ বোধ করছে রানা। রক্তবমি বন্ধ হয়েছে। গোড়ালির ওপরের ক্ষতটা এখনো পুরোপুরি শুকায়নি বটে, তবে আগের সেই দগদগে ভাবটা নেই। 'ডাক্তার বলেছে, সাপের বিষে আমার হয়তো আর কখনো ক্ষতি হবে না। ভাবছি ব্যবসায় নেমে পড়বো কিনা। ভয় না পেয়ে সিটাডেলিস নাড়াচাড়া করতে পারে, এমন লোক ক'জন আছে?'

আবার একগাল হাসলেন কর্নেল। গোলাপের তোড়া নিয়ে কেবিনে ঢোকার সময় প্রথম হেসেছিলেন। তোড়াটা এতো বড় যে আর কোনো জায়গা না পেয়ে রাখতে হয়েছে রানার বিছানার ওপর, বিছানার এক চতুর্থাংশ দখল করে রেখেছে ওটা। তোড়াটা পাঠিয়েছেন আলিজান আকরাম, সশরীরে উপস্থিত হতে না পারার জন্যে একটা চিরকুটে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকদিন থেকে ক্যান্সারে ভুগছেন। ক'দিন হলো হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

'এদিকের আর সব খবর কি?' জানতে চাইলো রানা।

গড় গড় করে বলে গেলেন কর্নেল বেনিন। অবশেষে ভিক্টর লজেনকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। ডি. ই. এ. নিজেই তাকে একটা

প্লেনে করে তাড়াতাড়ি টাম্পা শহরে নিয়ে গেছে। তবে লাস আনিমাস বিধ্বস্ত হবার কাহিনী কোনো খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। কারণটা বুঝতে পারলো না রানা।

'সরকারকে শুধু শুধু বিব্রত হতে হবে,' ব্যাখ্যা করলেন কর্নেল। 'এ-ধরনের বড় সাইজের একটা অপারেশন সরকারী এজেন্সিগুলোর অগোচরে সংঘটিত হলো, স্বীকার করার মধ্যে অসুবিধে আছে। তাই খবরটা চেপে যাওয়া হয়। তবে, চিন্তা করবেন না, আমাজনে আরো অনেক লাশ ভাসবে।'

ডি. এ. এস.-এর প্রতি কৃতজ্ঞ রানা। সময় মতো পৌঁছে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে তারা। তাড়াতাড়ি হাসপাতালের সেবা না পেলে কি ঘটতো বলা যায় না। ইতোমধ্যে সমস্ত আয়োজন শেষ হয়েছে, গুরুতর কিছু ঘটলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জীবিত অবস্থায় কলম্বিয়া ত্যাগ করতে পারবে বলে আশা করছে রানা।

'আপনাকে একটা কথা জানানো হয়নি,' বললেন কর্নেল। 'লাস আনিমাসে একটা লাশ আমরা চিনতে পেরেছি। বিস্ফোরণের ধাক্কায় জঙ্গলের কিনারায় গিয়ে পড়েছিল সে। লোকটার নাম ব্রান্ট হাইন-ম্যান। সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে ইটালি সরকার অনেক দিন থেকে খুঁজছিল তাকে। মিলানের রেল-স্টেশন উড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ ছিলো তার নামে।'

'কার্টেল আসলে আন্তর্জাতিক সংগঠন,' বললো রানা। 'গোটা দুনিয়া থেকে লোক সংগ্রহ করেছে তারা। জানা কথা, ধর্মঘটের সময় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্ল্যান করছিল ওরা। এখন বোধহয় আর তা করতে পারবে না।'

'কার্টেল মুখ থুবড়ে পড়বে, ভাবতে ভালোই লাগে,' বললেন

কর্নেল। 'কিন্তু ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়নি। তবে আশার কথা হলো, সেই লোকটা, ওদের লিডার, বেঁচে নেই।'

'মানুষটা বেঁচে নেই, ঠিক; কিন্তু তাঁর মেথড বা পদ্ধতিটা তো থাকবে—কারো শিখে নিতে অসুবিধে কি?'

'কোনো অসুবিধে নেই,' গম্ভীর সুরে বললেন কর্নেল। 'লোকটা যতো না বিপজ্জনক ছিলো, তারচেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক তার পদ্ধতিটা।'

সমস্যাটা কর্নেল বুঝতে পারছেন দেখে খুশি হলো রানা। কার্টেলের ক্ষমতা কমে গেছে, এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। সারা দুনিয়ায় যতো কোকেন সরবরাহ করা হয় তার শতকরা আশিভাগ সরবরাহ করে কার্টেল। কোকেন ছাড়া অন্যান্য ড্রাগও সরবরাহ করে তারা। তাদের টাকা আছে, ক্ষমতা আছে, আছে শক্তিশালী সংগঠন। বিবেকের ধার না ধেরে এ-সব তারা ব্যবহার করতেও আগ্রহী। 'আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কর্নেল,' বললো রানা। 'আবার ওরা আঘাত করবে।'

'আমি জানি,' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন কর্নেল। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'ধন্যবাদ, মিঃ রানা।'

'গুড বাই, কর্নেল।'

হাসিমুখে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল বেনিন।

পরদিন ধর্মঘট। সেদিনই কলম্বিয়া ত্যাগ করলো রানা।

সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের এক্সট্রাডিশন নীতির বিরুদ্ধে একদিনের ধর্মঘট আহ্বান করেছে কার্টেল। মেডিলিন শহরের মাঝখানে কয়েক হাজার দাঙ্গাবাজ লোক জড়ো হলো। ওখান থেকে জঙ্গী মিছিল নিয়ে

সরকারী অফিস পাড়ায় হামলা চালালো তারা। অচল করে দিলো গোটা শহর। শুধু মেডিলিন নয়, অন্যান্য শহর থেকে একই ধরনের রিপোর্ট আসতে লাগলো। কার্টেল দাবি করলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এক্সট্রাডিশন চুক্তি বাতিল করতে হবে।

ধর্মঘট সফল হবার পর আরো শক্তি সঞ্চয় করলো কার্টেল। এরপর তারা সতর্কতার সাথে বাছাই করে একের পর এক খুন করতে শুরু করলো বিচারকদের। এক্সট্রাডিশন চুক্তি বলবৎ হবার পর তেরোজন প্রথমশ্রেণীর ড্রাগ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হলো বিচারের জন্যে। কলম্বিয়ান সুপ্রীম কোর্টেরও তেরোজন বিচারপতি খুন হলেন কার্টেলের হাতে। উনিশ শো সাতাশির মাঝামাঝি সময়ে, কয়েকটা কোর্টের সম্মতি পেয়ে, এক্সট্রাডিশন চুক্তি বাতিল ঘোষণা করলেন কলম্বিয়া সরকার।

কিছুদিন কর্নেল বেনিনের সাথে যোগাযোগ রাখলো রানা। ডি. এ. এস.-এর চাকরিটা ছাড়েননি তিনি, তবে রাজনীতিতে নতুন ক্যারিয়ার গড়ে তোলার জন্যে কাজ করছেন। আগামী বার নির্বাচনে দাঁড়াবেন। জনসভায় দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছেন, নির্বাচিত হতে পারলে কার্টেলের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।

তাঁর সম্পর্কে শেষ খবর পেলো রানা, নির্বাচন প্রচারাভিযানে বেরিয়েছিলেন তিনি। বুকারামাঙ্গা শহরে এসে, স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন।

—ঃ শেষ ঃ—